
অভীক দত্ত
পথ
হারাবো
বলেই

পথ হারাবো বলেই

অভীক দত্ত

আদরের নৌকা

Poth Harabo Bolei by Abhik Dutta
প্রকাশক ও কপিরাইটঃ আদরের নৌকা
যোগাযোগঃ adorernauka@gmail.com

https ://iwrite.app

১

কালকা মেইল রাইট টাইমে ছেড়েছে।

সিটে গম্ভীরভাবে বসেছিল ঋজু। বাপ্পা, তন্ময় আর শুভায়ু তাস নিয়ে বসেছে।

গরম নেই তেমন। ট্রেনে ওঠার আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে।

বাপ্পা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তাস শাফল করতে করতে বলল "কী রে, গম্ভীর হয়ে বসে না থেকে তাসটা ধরলে হয় না ভাই?"

শুভায়ু বলল "ভাইয়ের ফাটছে। এখন তাস খেলবে না মনে হয়"।

বাকি তিনজনই হাসল। বাপ্পা বলল "তোর ছমিয়া টু টিয়ারে যাচ্ছে আর তুই স্লিপারে। আওকাতটা বুঝেছিস তো ভাই?"

ঋজু গম্ভীর গলায় বলল "ফ্যামিলির সঙ্গে গেলে আমিও টু টিয়ারেই যেতাম। হ্যাজাস না ফালতু"।

বাপ্পা বলল "হ্যাঁ, তা তো বটেই। আমাদের তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। কী কুক্ষণেই না তোর পাল্লায় পড়ে বেড়াতে এলাম। সারাক্ষণ ফলো করে যেতে হবে তেনাদের"।

শুভায়ু বলল "যা ভাই, গিয়ে জল টল লাগবে নাকি দেখে আয়"।

বাপ্পা ভালমানুষের মত গলায় বলল "টল এখন লাগবে না, টল দিয়ে কী করবে, ফ্যামিলি আছে তো"।

ঋজু কটমট করে বাপ্পার দিকে তাকাল।

বাপ্পা তড়িঘড়ি তাস দিতে থাকল।

শুভায়ু বলল "হোটেল ফোটেল পেলে হয় সিমলায়"।

বাপ্পা বলল "না পেলে ঋজুর শ্বশুরকে বলব। কাকু কাকু ঘরের ব্যবস্থা কর"।

ঋজু কিছু বলল না। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল।

একটা বাচ্চা তাদের সামনে ঘুর ঘুর করতে লাগল। বাচ্চার মা এসে বাচ্চাটাকে নিয়ে গেল।

বাপ্পা আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে বলল "সব ভাল ভাল মেয়েগুলো তাড়াতাড়ি মা হয়ে যাচ্ছে"!

ঋজু বিরক্ত গলায় বলল "তোদের সঙ্গে আসাটাই ভুল হয়েছে। মার ধোর না খেয়ে যাই"।

বাপ্পা মিটমিটে চোখে শুভায়ুর দিকে তাকাল। শুভায়ু তাস দেখছিল। বলল "ঋজু সিরিয়াসলি বল তো, তোর কি ধারণা চান্দ্রেয়ী ডবল সিম মারছে?"

ঋজু বলল "তা কেন ধারণা হবে?"

শুভায়ু বলল "তাহলে হঠাৎ করে সিমলা ট্যুরের প্রোগ্রাম করলি কেন? ওরা ঘুরে ফিরে যেত, সমস্যা কী?"

ঋজু বলল "প্রেম করলে বুঝতে পারতিস"।

শুভায়ু বলল "প্রেম আর করতে হবে না। তোকে দেখে প্রেমের ওপর থেকে সমস্ত মোহ চলে গেছে ভাই। যা শুরু করেছিস! কী না, গার্লফ্রেন্ড বেড়াতে যাচ্ছে দেখে তোকেও যেতে হবে। চোখে হারানো যাবে না! কী দাবী মাইরি"।

ঋজু কিছু বলল না। বাকি তিনজনে তাস খেলতে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে ট্রেন বর্ধমান পৌঁছল। সবাই চা নিল। ট্রেন ছাড়লে বাপ্পা বলল "কীরে, এখানের বাকি দুটো সিটে তো কেউ এল না"!

শুভায়ু বলল "আসার দরকার নেই। ফাঁকা থাক"।

তন্ময় বলল "ওরম মনে হয়, টিটি মামা সব বেচে দেবে চাপ নিস না"।

তিনজনে আবার তাস খেলতে শুরু করল। ঋজু দেখল চান্দ্রেয়ী মেসেজ করেছে "খেয়েছ?"

ঋজু লিখল "না, দুর্গাপুর পেরলে খাব। তোমরা খেলে?"

চান্দ্রেয়ী লিখল "হ্যাঁ, জাস্ট। পরোটা মাংস। খেও কিন্তু"।

ঋজু লিখল "হ্যাঁ, হ্যাঁ খাব। আশে পাশে কোন হ্যান্ডু ছেলে আছে নাকি?"

চান্দ্রেয়ী লিখল “আছে তো, সামনেই বসে”।
ঋজুর জ্বলল একটু, পরক্ষণেই মনে হল চান্দ্রেয়ী ঢপ মারছে। লিখল “ছবি দেখাও”।
চান্দ্রেয়ী হেসে গড়িয়ে পড়ার স্মাইলি দিল।
ঋজু লিখল “বাবা কী করছে?”
চান্দ্রেয়ী লিখল “বই পড়ছে। এই শোন আমি ঘুমাই এখন। বাবা কেমন কেমন চোখে তাকাচ্ছে”।
ঋজু গুডনাইট পাঠিয়ে ফোনটা রাখল। রাত ন’টা পনেরো। কাল গোটা দিন ট্রেনে কাটাতে হবে।
টিটি এসে গেছেন। টিকেট চেক হচ্ছে। তাদের দুটো সিট খালি যাচ্ছে। দু চারজন ওয়েটিং লিস্টে থাকা লোক ভিড় করছেন। টিটি বোঝাচ্ছেন তাদের। ট্রেন একটু পরেই দুর্গাপুর দাঁড়াল। সিট দুটো সেটিং হচ্ছিল, এমন সময় একজন দৌড়তে দৌড়তে এসে টিটিকে বলল “স্যার, ফরটি ফাইভ ফরটি সিক্স আমাদের”।
টিটি ছেলেটার দিকে রেগে তাকিয়ে বললেন “এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?”
ছেলেটা কাচুমাচু মুখে বলল “দুর্গাপুর থেকে উঠলাম স্যার”।
টিটি বলল “টিকেট হাওড়া থেকে আর উঠছ দুর্গাপুর থেকে? ইয়ার্কি হচ্ছে? যা ইচ্ছা তাই নিয়ম করা যায় নাকি?”
ছেলেটা চেপে গেল। টিটি গজগজ করতে করতে ছেলেটার টিকিট চেক করে দিল। সিট বিক্রি করতে না পারার হতাশা টিটির চোখে মুখে।
ছেলেটা হাফাচ্ছিল। একটা ব্যাগ নিয়ে আপার বার্থে উঠে পড়ল।
ছেলেটার সঙ্গের মেয়েটাকে এতক্ষণে চোখে পড়ল ঋজুর।
কুণ্ঠাভরে ছেলেটার আপার বার্থে উঠে যাওয়া দেখে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল “আমাকে কেউ একজন একটা লোয়ার বার্থ ছেড়ে দেবেন, আমি উপরে উঠতে পারি না”।

২

ডিনারের পর মালিনী বিছানা করছিলেন। বিছানা বলতে তেমন কিছুই না। ট্রেনের সিটে চাদর পেতে দেওয়া। ট্রেনের বেডিং খুব একটা পছন্দ করেন না তিনি। তবু কিছু করার নেই। পথের জিনিস। পথে অত বায়ুগ্রস্থ হলে চলে না।
সৌরেন গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন। সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছিল। ট্রেনে হাজার ঝামেলা। অত ঝামেলা করে স্মোক করতে ইচ্ছা করছিল না।
চান্দ্রেয়ী মোবাইলে গান শুনছিল। তাদের সঙ্গে আরেক ভদ্রলোক যাচ্ছেন, ট্রেনে উঠেই উপরের বাঙ্কে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছেন।
সৌরেন মালিনীকে বললেন “ওষুধ খেয়েছ?”
মালিনী বিছানা করে বসলেন, “হ্যাঁ। তুমি শোও এবার। কাল সারাদিন ট্রেনে থাকতে হবে”।
সৌরেন বিরক্ত স্বরে বললেন “হ্যাঁ, তা আর বলতে। মামণি ঘুমাবে না?”
মালিনী মেয়ের দিকে রাগী চোখে তাকালেন। চান্দ্রেয়ী কান থেকে হেডফোন নামিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল “কী হল?”
মালিনী বললেন “ঘুমো এবার। কান এবং চোখ দুটোকে বিশ্রাম দে এবার। বাড়িতে তো সারাক্ষণ এদের সঙ্গেই কাটিয়ে যাচ্ছিস। বেড়াতে যাচ্ছিস যখন, আমাদের সঙ্গে তো কিছুক্ষণ কাটানো যায় নাকি?”
চান্দ্রেয়ী বিরক্ত মুখে কান থেকে হেডফোন খুলে মোবাইলে গান বন্ধ করল। বলল “বল কী বলবে?”
মালিনী রাগলেন খানিকটা “সীন ক্রিয়েট করবি না এখানে”।
সৌরেন হাত তুললেন “আহ, রেগে যাচ্ছ কেন! এখানে আবার এসব কেন?”
মালিনী চান্দ্রেয়ীর দিকে কড়া চোখে তাকালেন। চান্দ্রেয়ী বাবার দিকে তাকাল “এখন তো ঘুমিয়ে পড়ব, কাল

কথা বলি?"
মালিনী সৌরেনের দিকে তাকালেন "দাও কিনে আরও দামী ফোন! কত করে বললাম আগে কলেজ থেকে বেরোক"।
সৌরেন উঠলেন "বাথরুম হয়ে আসছি। তোমরা শুয়ে পড়"।
মালিনী গজগজ করতে লাগলেন। সৌরেন বেরোলেন। এসির তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমছে, রাতের দিকে ভালই ঠান্ডা লাগবে বোঝা যাচ্ছে। কাঁচের দরজা ঠেলে বাইরে এলে ট্রেনের ঝাঁকুনি অনেক বেশি বোঝা যায়। এক যুবক দরজা খুলে সিগারেট খাচ্ছে। এক হাত দরজায় এক হাত সিগারেটে। সৌরেনের ভয় লাগল। এই গতিতে এভাবে সিগারেট খাওয়া যথেষ্ট ঝুঁকির কাজ। তাছাড়া ট্রেনে স্মোকিং নিষিদ্ধ। বাথরুমেও খেতে পারত ছেলেটা। টিটি ধরলে নিশ্চয়ই ফাইন করবে। সৌরেন কিছু বলবেন ভেবেও হাল ছাড়লেন। বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিজের সিটে ফিরে এলেন। উপরের বাঙ্কে উঠলেন। মা মেয়ে লোয়ারে শোবে।
আসানসোল দাঁড়াল ট্রেন। কয়েক জন উঠলেন। মালিনী বললেন "ফোনটা এখনও রাখে নি দেখো"।
সৌরেন বললেন "ছাড়ো"।
মালিনী বললেন "ট্যুর এজেন্সিকে ফোন করবে মনে করাতে বলেছিলে"।
সৌরেন বললেন "করেছি"।
মালিনী বললেন "কখন করলে?"
সৌরেন বললেন "খানিকক্ষণ আগেই"।
মালিনী বললেন "তাহলে তো ভালই। আমি ঘুমালাম"।
সৌরেন বললেন "ঘুমাও"।
মালিনী নাক ডাকেন। কোথাও গেলে সহযাত্রীরা উষ্মা প্রকাশ করেন। প্রতিবারই সৌরেন এবং চান্দ্রেয়ী গুটিয়ে থাকেন।
ট্রেন আসানসোল ছাড়ার কিছুক্ষণ পরেই মালিনীর নাক ডাকার শব্দ আসতে শুরু করল। অবশ্য শুধু মাত্র মালিনী না, অনেকেরই নাক ডাকছে। চান্দ্রেয়ী কান থেকে হেডফোন নামিয়ে বলল "দেখো বাবা, মার শুরু হয়ে গেল"।
ট্রেনের ঝাঁকুনিতে সৌরেনের চোখ বুজে আসছিল। বললেন "তুই ঘুমিয়ে পড়। টাকা দিয়ে টিকেট কেটেছি। কেউ কিছু বললে দেখা যাবে"।
চান্দ্রেয়ী চুপ করে গেল।
সৌরেন টের পেলেন প্যান্টের পকেটে রাখা ফোনটা ভাইব্রেট করছে। খেয়াল ছিল না। আগে জানলে ফোনটা বের করে ট্রেনের নেটের পকেটে রাখতেন।
ফোন বের করে দেখলেন তনয়া ফোন করছে। বিরক্ত হলেন। এই সময় ফোন করার কথা না।
ফোনটা কেটে আপার বাঙ্ক থেকে নেমে বাথরুমের দিকে রওনা দিলেন। ফোনটা আবার বাজছে। কেটে দিলেন এবারেও। কাঁচের দরজা খুলে দেখলেন যুবকটি এখনও দরজা খোলা রেখেই দাঁড়িয়ে আছে।
বাথরুমে গিয়ে তনয়াকে ফোন করলেন, একবার রিং হতেই ধরল তনয়া "ঠিক ঠাক ট্রেনে উঠেছ?"
সৌরেন বিরক্ত গলায় বললেন "এখানে ফোন করতে বারণ করেছিলাম। তাছাড়া টাওয়ারও পাব না। কেটে যাবে যে কোন সময়"।
তনয়া আহত গলায় বললেন "একটা এস এম এস করতে কী হত? তুমি না হয় মেয়ে বউ নিয়ে ফুর্তি করতে যাচ্ছ, আমাকে তো সেই একা একাই থাকতে হচ্ছে"।
ট্রেনের শব্দ অনেকগুণ বেশি আসছে যদিও তবু তনয়ার গলা ঠিকঠাকই শুনতে পাচ্ছিলেন সৌরেন।
সৌরেন বললেন "তার জন্য যথেষ্ট টাকা দিয়ে এসেছি তোমাকে, রাহুলকে নিয়ে কোথাও ঘুরে এলেই পারো"।

তনয়া বললেন "তোমার সঙ্গে নিয়ে গেলেই পারতে। বউকে বলতে অফিসের কলিগ। কী এমন হত?"
সৌরেন বললেন "বেশ। পরের বার নিয়ে আসব। রাখছি এখন"।
তনয়া বললেন "মালিনী ঘুমিয়েছে?"
সৌরেন বললেন "এ প্রশ্ন কেন?"
তনয়া বললেন "এত বিরক্ত হয়ে হয়ে কথা বলছ কেন? আমার প্রয়োজন কি ফুরিয়েছে?"
সৌরেন বললেন "ট্রেনে শুনতে পারছি না কিছু। পরশু চণ্ডীগড়ে পৌঁছে ফোন করছি। রাখো এখন"।
তনয়া বললেন "তোমাকে একটা কথা বলব?"
সৌরেন বিরক্ত গলায় বললেন "বল যা বলবে"।
তনয়া বললেন "তোমার মেয়ে প্রেম করছে। এদিক সেদিক ঘুরছেও। মাঝে একবার বকখালি গেছিল। সে ছেলে তোমাদের সঙ্গে একই ট্রেনে আছে। মেয়ে বড় হয়ে গেছে সৌরেন"।
সৌরেন হতভম্ব হলেন, বললেন "তুমি এত খবর কী করে জানলে? আর এখন এই ট্রেনের মধ্যে কথাটা বলছ?"
তনয়া গম্ভীর গলায় বললেন "রাখছি এখন, ট্রেন থেকে নেমে ফোন কোর"।
ফোনটা কেটে গেল।
সৌরেন তড়িঘড়ি তনয়ার নাম্বারে ডায়াল করতে লাগলেন। ফোন সুইচড অফ বলতে লাগল।

৩

ট্রেন হাজারিবাগে দাঁড়িয়ে আছে।
এক মিনিট দাঁড়াবার কথা ছিল। অনেকক্ষণ হয়ে গেল নড়ছে না।
ঋজু মিডল বার্থে শুয়েছিল। গরম লাগছিল তার।
নেমে দরজার কাছে গেল।
দেখল দুর্গাপুর থেকে ট্রেনে ওঠা ছেলেটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে।
ঋজু বলল "ট্রেন কিন্তু ছেড়ে দেবে যে কোন সময়"।
ছেলেটা হাসল। বলল "সিগন্যাল নেই তো। উঠে যাব, চাপ নেই"।
ঋজু বলল "আপনি কলকাতার?"
ছেলেটা বলল "হ্যাঁ। ও দুর্গাপুরের"।
ঋজু বলল "ওহ। হানিমুন?"
ছেলেটা অন্যমনস্কভাবে সিগারেট টানতে টানতে বলল "হু"।
ঋজু সিগন্যালের দিকে তাকাল। এখনও লাল হয়ে আছে। শুনশান স্টেশন। দু চারজন এদিক সেদিক বেডিং পেতে ঘুমিয়ে আছে। ট্রেনের সবাই ঘুমাচ্ছে।
ঋজু ট্রেন থেকে নেমে বলল "ছোটবেলায় কোথাও বেড়াতে গেলে বাবা যখন ট্রেন থেকে নামত ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতাম। যতক্ষণ না ট্রেনে উঠত, টেনশন হত খুব"।
ছেলেটা আনমনে বলল "আমার কোনকালেই বাবা ছিল না"।
ঋজু বলল "ওহ, আই অ্যাম সরি। মারা গেছেন?"
ছেলেটা মাথা নাড়ল, "কোনকালেই দেখি নি"।
ঋজু বলল "ওহ"।
ছেলেটা ঘড়ি দেখল "একটা কুড়ি। বাড়িতে থাকলে এই সময়টা জেগেই থাকতাম"।
ঋজু হাসল "আমিও। ফোন করি"।
ছেলেটা বলল "কাল অবধি তাই করেছি"।

ঋজু অবাক হল "মানে? প্রেম করে বিয়ে? পালিয়েছেন নাকি?"
ছেলেটা ঋজুর দিকে তাকিয়ে হাসল "হ্যাঁ। আজকেই। ওদের বাড়ির লোক জেনে গেছে হয়ত এতক্ষণে"।
ঋজু হাঁ করে ছেলেটার দিকে তাকাল।
ছেলেটা বলল "অবাক হবার কিছু নেই। পালানোটা খুব কমন আজকাল। প্ল্যানিং করে টিকিট কেটে ছিলাম মাস কয়েক আগে। তবে সমস্যাটা অন্য। আমি বেকার ছেলে। পকেটে এই মুহূর্তে দেড়শো টাকা পড়ে আছে। এক বন্ধু কথা দিয়েছিল হাজার দশেক টাকা ধার দেবে, শেষমুহূর্তে তাকে আর খুঁজে পেলাম না। অনেকবার ফোন করেছিলাম ফোনও ধরে নি। কোথায় যাব, কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না"।
একটা চা ওয়ালা চলে এল কোথা থেকে। ঋজু বলল "চা খাবেন?"
ছেলেটা মাথা নাড়ল।
ঋজু চা নিল, অন্য সময় হলে নিত না, ছেলেটার কথা শুনে কী বলবে ঠিক করতে পারছিল না।
ছেলেটা বলল "আপনার বন্ধুরা সবাই ঘুমোচ্ছে। আপনি ঘুমোবেন না?"
ঋজু বলল "ঘুম পাচ্ছে না ঠিক"।
ছেলেটা আরেকটা সিগারেট ধরাল "ও খুব ক্লান্ত। সকাল থেকে খুব টেনশন গেছে। এখন মরার মত ঘুমোচ্ছে"।
ঋজু বলল "ওহ"।
ছেলেটা বলল "আমার উল্টো হয়। টেনশনেও ঘুম হয় না, টেনশন শেষ হয়ে গেলেও ঘুম হয় না। আপনি কখনও হাজারিবাগে এসেছেন আগে?"
ঋজু চুপচাপ চা খাচ্ছিল। বলল "নাহ, আসিনি"।
ছেলেটা বলল "ছোটবেলায় একবার এসেছিলাম। সাত আট বছর বয়স হবে। মার এক ক্লায়েন্ট নিয়ে এসেছিল। এখনো মনে আছে লোকটা মাকে একটা ঘরে নিয়ে চলে গেল, আমাকে একটা ছোট গাড়ি দিয়েছিল খেলার জন্য। আমি খানিকক্ষণ গাড়িটা নিয়ে খেলে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিলাম। একটা লম্বা লোক, ইয়া গোঁফ, আমাকে কোলে নিয়ে কত কিছু বোঝাচ্ছিল, আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না"।
ছেলেটা চুপ করে গেল।
ঋজুর চা শেষ হয়ে গেছিল। ছেলেটার কথা শুনে তার একটু অস্বস্তি হচ্ছিল।
একটু ইতস্তত করে বলল "আমি গিয়ে শুই বরং। আপনি চলে আসুন"।
ছেলেটা বলল "হ্যাঁ। আপনি ভেতরে যান"।
ঋজু ট্রেনে উঠে বাথরুমে গেল। ছেলেটার মধ্যে অদ্ভুত এক বিষণ্ণতা আছে, বেশিক্ষণ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় না। যেটুকু বোঝা গেল ছেলেটা মেয়েটাকে নিয়ে প্ল্যান করে বাড়ি থেকে পালিয়েছে কিন্তু পকেটে টাকা কড়ি নেই। সে ঠিক করল বাকি তিন জনের সঙ্গে কথা বলে ওদের নিজেদের সঙ্গে নিয়ে নেবে। পরে দেখা যাবে, যা হবে হবে।
ট্রেনটা নড়ে উঠল।
ঋজু বাথরুম থেকে বেরিয়ে মিডল বার্থে উঠে শুল।
ট্রেনের দুলুনিতে ঘুম এসে গেল তার।
একটানা ঘুমিয়ে পড়েছিল।
ঘুম ভাংল চ্যাঁচামেচি আর কান্নাকাটির শব্দে। ধড়মড় করে উঠে বসে বিরক্ত গলায় বলল "কী হল, এত ক্যাওয়াস কীসের?"
বাপ্পা বলল "আরে ভাই দুর্গাপুর থেকে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে উঠল না?"
ঋজু ঘুম জড়ানো গলায় বলল "হ্যাঁ। কী হয়েছে?"
বাপ্পা বলল "আরে ছেলেটা মাঝপথে কোনো একটা স্টেশনে নেমে গেছে। মেয়েটা কান্নাকাটি শুরু করেছে"।

ঋজু হাঁ করে বাপ্পার দিকে তাকিয়ে থাকল।

৪

ভোর সাড়ে চারটে। সৌরেনের ঘুম ভেঙে গেল।
অন্যান্যদিন বাড়িতে থাকলে এই সময়ে কোনকালেই ঘুম ভাঙে না।
ট্রেনে একটা অস্বস্তি কাজ করে। তার ওপরে তনয়ার কথাটা শোনার পর থেকে মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। মেয়েটা কখন যে বড় হয়ে গেল বুঝতেই পারলেন না। এই তো কিছুদিন আগেও বাবা বলতে অজ্ঞান ছিল। তাহলে কি মালিনীই ঠিক? ফোনটা দেওয়াই ভুল হয়েছে? ঠিকই তো, মেয়েটা ফোন পাবার পর থেকেই কেমন যেন দূরে সরে গেল। সারাক্ষণ ফোন নিয়ে ব্যস্ত, ফোন দেখে নিজের মনেই হাসছে, কখনও কখনও ছাদে চলে যাচ্ছে, প্রথম প্রথম খুব একটা আমল দেন নি, এখন মনে হচ্ছে দিতে হবে।
ট্রেন বেশ ভালো জোরে চলছে। কামরার ভেতরটা বেশ ঠান্ডা হয়ে গেছে।
সৌরেন উঠে বেশ খানিকক্ষণ কমোডে বসে বুঝলেন বৃথা চেষ্টা। জায়গা পরিবর্তন হলেই পেট পরিষ্কার হওয়া নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। বয়স যত বাড়ছে বাওয়েল মুভমেন্টে সমস্যা হচ্ছে।
সিগারেট খেতে পারলে খানিকটা লাভ হত হয়ত।
বাথরুম থেকে বেরিয়ে দরজা খুলে করিডরে হাঁটতে শুরু করলেন।
দু চারজন বাদে ট্রেনের সবাই ঘুমোচ্ছে।
তারা নামবে সামনেই কোন স্টেশনে।
সৌরেন বুঝতে পারলেন না কোন স্টেশন আসছে।
নিজের বাঙ্কে উঠে শুলেন। বেশ খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করলেন। তনয়ার কথাটা আবার মাথায় এল। মেয়ের প্রেমিক। এই বয়সে? কী করে সে ছেলে? তার মনে পড়ে গেল স্কুল লাইফে এক মেয়ের প্রতি টান ছিল। মেয়েটা শ্যামবাজারের দিকে থাকত। দাঁড়িয়ে থাকতেন বাড়ির সামনে, সে সময় মেয়েটা টিউশন পড়তে যেত। তখন মোবাইল ছিল না কিছুই ছিল না।
আজকাল সব কিছু কত সহজ হয়ে যাচ্ছে।
এর আগে চান্দ্রেয়ীর জন্য একটা ছেলে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। বুঝতেন সৌরেন।
প্রথমে কিছু বলেন নি। একদিন গাড়ি নিয়ে বাড়িতে ঢোকার সময় দেখলেন মেয়েও ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছে। সে সময়টা চুপচাপ ছিলেন। চান্দ্রেয়ী ঘরের ভিতর ঢুকতেই বিকাশদের ফোন করে ডেকে নিয়েছিলেন। ছেলেটাকে ক্লাবে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মার ধোর করা হয়েছিল। হসপিটালে ভর্তি করতে হয়েছিল। তারপর থেকে কোন রকম জ্বালাতন হয় নি।
এবারেও কি সেই ছেলেটাই? সৌরেনের বিরক্ত লাগছিল। মালিনীর সঙ্গে কোথাও গেলেই তনয়া এরকম অদ্ভুত আচরণ শুরু করে দেয়। বলে দিলে কী সমস্যা হত? অথচ তনয়াকেও তো কম গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সৌরেন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। শরীরের জৈবিক চাহিদার জন্য যে জীবনে কতরকম আপস করতে হয়!
মালিনী বিকট স্বরে নাক ডাকছেন। বিরক্ত হয়ে খানিকক্ষণ শুয়ে থাকলেন সৌরেন।
খানিকক্ষণ পরে এক স্টেশনে এসে ট্রেন দাঁড়াল। অদ্ভুত নাম স্টেশনটার। "ভাবুয়া রোড"।
বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না হয়ত।
সৌরেন বাঙ্ক থেকে নেমে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।
প্ল্যাটফর্মের মধ্যে এক চা ওয়ালাকে দেখে ডাকলেন। দুধ চা নিলেন। বাড়িতে থাকলে দুধ বর্জন করেন, এখানে ইচ্ছা করেই দুধ নিলেন। "পথে নিয়ম নাস্তি" আপ্তবাক্য মনে পড়ে গেল।
এক যুবক যুবতী সম্ভবত হানিমুনে যাচ্ছে। একসঙ্গে উঠে বাথরুমে যাচ্ছে হাত ধরাধরি করে। সৌরেনের নিজেদের হানিমুনের কথা মনে পড়ে গেল। মালিনী একটা সময় কত রোগা ছিল! এখন দেখলে কে বলবে!

শারীরিক কোন রকম আকর্ষণও জন্মায় না আজকাল মালিনীকে দেখলে।
শেষবার কবে একত্রিত হয়েছিলেন? মনে করতে গিয়ে হাল ছেড়ে দিলেন সৌরেন।
তনয়া ছিল বলেই হয়ত অনেকটা শূন্যতা পূর্ণ হয় তার।
চা শেষ হতেই ট্রেনটা দুলে উঠল। সৌরেন কামরার মধ্যে প্রবেশ করলেন।
হানিমুন কাপল বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে ঘনিষ্ঠভাবে চুমু খাচ্ছে।
সৌরেনের হঠাৎ মনে হল, এরা নিজেদের মুখের গন্ধ পায় না? মর্নিং ব্রেথ?
পরক্ষণেই মনে হল, বয়স হচ্ছে বলেই হয়ত এসব বেয়াড়া প্রশ্ন মাথায় আসে।

৫

সকাল দশটা। ট্রেন এলাহাবাদে পৌঁছেছে। মেয়েটি চুপ করে বসে আছে জানলার কোণায়। প্ল্যাটফর্মে নেমে চারজন চা খাচ্ছে।
ঋজু খানিকটা চুপ হয়ে গেছে, বাপ্পা উত্তেজিত গলায় বলল "এবার কী করবি?"
শুভায়ু বলল "আমরা কী করব? মেয়েটাকে তো বারবার বলা হচ্ছে বাড়ির ফোন নাম্বার দিতে, কিছুতেই দিচ্ছে না দেখছিস তো!"
বাপ্পা বলল "দেখ ভাই, ভাল কথা বলি, আমরা জানিও না কী কেস, আদৌ গোটাটাই গট আপ কী না, এরকম হয় শুনেছি আমি ট্রেনে, আমরা কেন অত চাপ নিচ্ছি, মেয়েটা যা ইচ্ছা সেটাই করুক না, আমাদের কী?"
তন্ময় মাথা নাড়ল "আমারও তাই মনে হয়। আমরা এমন করছি যেন বাপের বিয়ে লেগেছে, এসব ব্যাপারে তো এত চাপ নেবার কিছু হয় নি। ছেলের কুড়কুড়ি উঠেছিল, ছেলে মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে, মাঝরাস্তায় কুড়কুড়ি নেমে গেছে, ছেলেও নেমে গেছে, এবার মেয়ে কী করবে তার দায় আমাদের কেন থাকবে?"
সিগন্যাল হয়ে গেছিল। ঋজু কিছু না বলে ট্রেনে উঠল। তার দেখা দেখি বাকিরাও উঠল।
বাপ্পা ফিসফিস করে বলল "সকালে ভাল করে হাগতেও পারলাম না, কোন বাথরুমেই এখনো স্বচ্ছ ভারত অভিযান হল না আর তার মধ্যে এত সব ঝাম শুরু হয়ে গেল"।
শুভায়ু বলল "এসিতে গিয়ে হেগে আয় না, কে দেখতে যাচ্ছে"।
বাপ্পা বলল "তারপর রেল পুলিশ আমার পেছনে রুল ঢুকিয়ে বাকি হাগাটাও বের করে নিক আর কী!"
ঋজু বিরক্ত গলায় বলল "থাম ভাই, ট্রেনে অনেক লোক যাচ্ছে, শুনতে পেলে বাজে ব্যাপার"।
ট্রেন নড়ে উঠল। তারা নিজেদের সিটের দিকে এগোল। শুভায়ু জানলার ধারে গিয়ে বসল।
ঋজু মেয়েটাকে বলল "আপনি কিছু ভাবলেন?"
মেয়েটা শূন্য দৃষ্টিতে ঋজুর দিকে তাকিয়ে বলল "দেখছি, দিল্লিতে আমার পিসি থাকে, ফোন করে নেব"।
বাপ্পা খুশি মুখে ঋজুর দিকে তাকাল। বোঝাতে চাইল, যাক, ফাঁড়া কেটে গেছে।
ঋজু কিছু বলল না। চান্দ্রেয়ী মেসেজ করেছে "কী করছ? খেয়েছ?"
ঋজু লিখল "এবার খাব। তোমরা খেলে?"
"হ্যাঁ। সেই সেম ওল্ড ব্রেকফাস্ট। খেয়ে নাও"।
ট্রেনের প্যান্ট্রি কারের ছেলেটা ব্রেকফাস্ট নিয়ে ঘুরছিল। ঋজু বাপ্পাকে বলল "ডাক দে প্যান্ট্রি কারের ছেলেটাকে। খেয়ে নি"।
বাপ্পা ইয়ার্কি মেরে বলল "প্যান্টি কার?"
পরক্ষণেই মেয়েটার দিকে তাকিয়ে সচেতন হয়ে নড়ে চড়ে উঠে দাঁড়াল "দাঁড়া দাঁড়া ডাকছি"।
তন্ময় মোবাইলে খুট খুট করতে করতে বলল "সিমলায় বেশি শীত নেই, মানালিতে ফাটবে"।
শুভায়ু বলল "তাতে কী, সোয়েটার নিয়েছিস তো?"

তন্ময় বলল “তা নিয়েছি। তবে ছোটবেলায় একবার গেছিলাম। হেবি শীত ছিল, এবার সেরকম বুঝলে হোটেলের কম্বল জড়িয়ে বেরোব”।
ঋজুর ফোন বাজছিল। ঋজু দেখল বাবা, সে ফোনটা নিয়ে উঠে বাইরের দিকে গেল, বলল “বল”।
“কোথায় এখন?”
“এলাহাবাদ পেরোলাম”।
“ভাল। সকালে খাওয়া দাওয়া হয়েছে?”
“হ্যাঁ। আর সব ঠিক আছে?”
“হ্যাঁ। তুমি অফিস বেরিয়ে গেছ?”
“এই বেরোব। সাবধানে থাকিস, আজ তো সারাদিন ট্রেনে”?
“হ্যাঁ। কাল ভোররাতে নামব যদি রাইট টাইম থাকে”।
“এখন তো রাইট টাইমই যাচ্ছে?”
“মোটামুটি, আধঘন্টা এক ঘন্টা লেট”।
“আধঘন্টা মেক আপ হয়ে যায়, চিন্তার কিছু নেই”।
“হ্যাঁ...”। ঋজু একটু ইতস্তত করল।
“কিছু বলবি?”
“বলছি বাবা একটা সমস্যা তৈরী হয়েছে”।
“কী সমস্যা?”
“একটা কাপল উঠেছিল আর কী। তার মধ্যে থেকে ছেলেটা পালিয়েছে, মেয়েটা একা যাচ্ছে”।
“ওহ, এগুলো খুব পুরনো ট্রিক ঋজু। সাবধানে থাক”।
“বুঝেছি বাবা, রাখছি এখন”।
“ওকে। কিন্তু আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, এদের কিন্তু আমি খুব ভাল করে চিনি। দূরে থাকবি। আমি দুপুরে আবার ফোন করছি”।
ঋজু মাথায় হাত দিল। কথাটা বাবাকে না বললেই ভাল হত। এবার পরপর ফোন করে এই একই কথা বলে যেতে থাকবে।
ট্রেনের দরজা খোলা। গরম হাওয়া ঢুকছে। উত্তরপ্রদেশের গরম কুখ্যাত। ট্রেন চললেও জানলা দিয়ে লু আসতে শুরু করবে এর পরে। বাথরুমের জল গরম হয়ে যাবে। গোটা দিনটা স্নান না করে থাকতে হবে ভাবতেই ঋজুর জ্বর চলে আসছিল। বাথরুমগুলোও খুব একটা পরিষ্কার নয়। ট্রেনে না চড়লে বোঝা যায় না কিছু মানুষের টয়লেট ট্রেনিং এখনো লোয়ার নার্সারি ষ্ট্যাণ্ডার্ডেই পড়ে আছে।
ঋজু সিটে গিয়ে দেখল সবাই ব্রেকফাস্ট খাওয়া শুরু করেছে। মেয়েটাও। একটু জোরেই খাচ্ছে। সম্ভবত খিদে পেয়েছিল খুব বেশি। বাপ্পা বলল “খেয়ে নে ভাই, কানপুরে লাঞ্চ বলে দিয়েছি। ডিম। পার পাব্লিক দুখান ডিম”।
ঋজু নিজের ব্রেকফাস্টের প্যাকেটটা হাতে নিল। এরা পাউরুটি সেঁকে দেয় না। কাঁচা পাউরুটিই দিয়ে দেয়। অন্যান্য সময় হলে ঋজু খেত না। ট্রেনে খিদে পেয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি।
বাপ্পা মেয়েটাকে বলল “দিল্লিতে পিসির বাড়ি চেনেন তো?”
মেয়েটা খেতে খেতে বলল “ফোন করে নেব, ঠিকানা আছে ব্যাগে”।
ঋজু একটা পাউরুটি আর খানিকটা অমলেট খেল।
শুভায়ু ঋজুর দিকে তাকিয়ে হালকা গলায় বলল “যা ভাই, বউদির কোচ ঘুরে আয়। এসি টু টিয়ার। উইব্বাস!”

ঋজু শুভায়ুর দিকে কটমট করে তাকাল।

৬

ভদ্রলোকটি গম্ভীর হয়ে সৌরেনের দিকে তাকিয়ে বললেন “ক্যান ইউ ইমাজিন? এত টাকা দিয়ে টিকেট কেটে ইঁদুর দেখতে হবে ট্রেনে? স্টেটসে থাকলে এতক্ষণে তুলকালাম হয়ে যেত”!
মুঘলসরাইতে আগে যিনি আপার বাঙ্কে ছিলেন, তিনি নেমে গেছেন। এই ভদ্রলোক ওখান থেকেই উঠেছেন।
সৌরেন জানলা দিয়ে ট্রেনের বাইরে দিকে তাকিয়ে বললেন “ট্যুইট করে দিন রেলমন্ত্রকে, ব্যবস্থা হয়ে যাবে”।
ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে হাত দিয়ে সৌরেনের কথা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বললেন “হোয়াট দ্য হেল, ট্যুইট করতে হলে নেটওয়ার্ক দরকার তো, এখানে নেটওয়ার্ক কোথায়? পাচ্ছিই না কিছু। আসছে যাচ্ছে”।
চান্দ্রেয়ী ফুট কাটল “কোন স্টেশনে দাঁড়ালে ওয়াই ফাই ইউজ করতে পারেন। প্রায় সব স্টেশনেই আছে”।
সৌরেন বললেন “আপনি বেসিক্যালি বাঙালি? মানে ওয়েস্টবেঙ্গলে বাড়ি?”
ভদ্রলোক বললেন “হ্যাঁ, এখন পশ্চিমবঙ্গে, অরিজিন পূর্ববঙ্গ, কিন্তু বছরের বেশিরভাগ সময়েই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। ভেবেছিলাম স্টেটসে আর সেটল করব না, দেশে ফিরে সোশ্যাল সারভিস করব, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে হিমালয়ান মিস্টেক করেছি”।
ভদ্রলোক জোরে একটা শ্বাস ছাড়লেন।
সৌরেন চান্দ্রেয়ীর দিকে তাকালেন। মোবাইলে নিশ্চয়ই টাওয়ার পাচ্ছে, নইলে এত খুট খুট করবে কেন। সৌরেন ভাবতে চেষ্টা করলেন এখন নিশ্চয়ই ছেলেটার সঙ্গে কথা বলছে। ছেলেটা কী করে, কোন বাড়ি, কী জাত... সৌরেনের বিরক্ত লাগছিল। মালিনী থপথপে কোলা ব্যাঙের মত বসে রয়েছে। মাঝে মাঝেই এক গাদা কুকিজ বের করে খাচ্ছে। বাড়িতেও এই চলে। কুকিজ, ব্রাউনি সব খাবে, তারপরে পনেরো মিনিট রাস্তায় হেঁটে হাফাতে হাফাতে এসে বলবে “উফ, অনেক পরিশ্রম হয়ে গেল”।
সৌরেন নিজের মনেই মালিনীর সঙ্গে তনয়ার তুলনা করে নিলেন। তনয়া স্লিম নয় একেবারেই একটু মোটার দিকে কিন্তু কার্ভি, সেক্সি তো বটেই। নব যুবকদের ফ্যান্টাসি করার আদর্শ।
হয়ত আছেও কেউ। সৌরেনের বুকের ভিতর খানিকটা চিনচিন করল। টাকার সম্পর্কও কখনও কখনও হৃদযন্ত্রে ঢেউ তোলে। এ এক অদ্ভুত অবস্থা।
আরেকটু ভেবে দেখলেন এই থপথপে মালিনীকেও কেউ প্রেম করার চেষ্টা করলে একই ভাবে হিংসা করবেন। এই যে তার মেয়ে, এত বড় হয়েছে, একটা সময় এত বাবা বাবা করত, এখন অন্য কোন অজানা ছেলের সঙ্গে প্রেম করছে মনে পড়তেই কেমন কেমন লাগছে তার।
দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সৌরেন। এই বেড়াতে যাওয়াটাই মালিনীর পরিবর্তে তনয়া গেলে অন্যরকম হত।
ভদ্রলোক বললেন “ক্যালিফোর্নিয়ায় ছিলাম বুঝলেন, সে ব্যবস্থা শুনলেই মাথা খারাপ হয়ে যাবে, আর অ্যামট্রেকের কথা তো ছেড়েই দিলাম। না মানে জাস্ট ভাবুন, ওরা পারছে আমরা পারব না কেন? লোকে দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পোষে জানতাম, এ দেখি ইঁদুর পোষে। কী সর্বনাশ। ঘুমাচ্ছি আর ইঁদুর যদি এসে... উফ ভাবতেই পারছি না”।
ভদ্রলোক শিউরে ওঠার ভঙ্গি করলেন।
সৌরেনের বিরক্ত লাগছিল। লোকটার কথা বেশি বলার স্বভাব আছে বোধ হচ্ছে। সিডি কেটে গেলে যেভাবে একই জিনিস রিপিটেডলি হতে থাকে, ভদ্রলোকের সম্ভবত সেই রোগ আছে। ক্যালিফোর্নিয়া ভাল তো ওখানেই থাক না বাপু, এদেশে কেন? সৌরেনের অনেকক্ষণ পরে একটা গালাগালি মনে পড়ল। “শো অফ চোদা”। এই টাইপের মালগুলো একবার বিদেশ থেকে ফেরার পরে সেথায় এই ভাল ছিল, ঐ ভাল ছিল করতে থাকে। সৌরেনের খুব ভদ্র মুখ করে ভদ্রলোককে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হল এতই যখন ভাল ছেলেন

তখন কেন গাঁড় মারাতে এলেন? করতে পারলেন না। সামনে মেয়ে আছে, বউ আছে, বয়সের ছাপ আছে, একটা ভাল চাকরি, শরীরে শপিং মলে যাওয়ার, মাল্টিপ্লেক্সে ভাল সিনেমা দেখার গন্ধ এসে গেছে। এখন এসব কথা ভাবাও পাপ।
সৌরেন বেশ খানিকক্ষণ বসে থাকলেন চুপচাপ।
ট্রেন কানপুর ছেড়েছে কিছুক্ষণ আগে। লাঞ্চ দেবার কথা যখন তখন। মালিনী বাথরুমে গেল। ভদ্রলোকও গজগজ করতে করতে বাইরের দিকে গেলেন।
সৌরেন চান্দ্রেয়ীর দিকে তাকালেন, শান্ত গলায় বললেন “ছেলেটা কী করে?”
চান্দ্রেয়ী চমকাল খানিকটা, ফ্যাকাশে মুখে তার দিকে তাকিয়ে বলল “কোন ছেলে বলত?”
সৌরেন বাইরের দিকে তাকালেন। একঘেয়ে ক্ষেত বাড়ি, পশ্চিমবঙ্গের মত সবুজ না এসব জায়গা, রুক্ষ, তথাকথিত গো বলয়, ট্রেনের লোক জনের আচরণও অদ্ভুত এখানকার। ট্রেনকে পৈতৃক সম্পত্তি মনে করে। ভাবে যা ইচ্ছা করলেই জল। মাঝে মাঝেই চেন টেনে নেমে যায়।
চান্দ্রেয়ী বলল “কোন ছেলের কথা বলছ বললে না তো বাবা?”
ভদ্রলোক ফিরে এসেছেন,গম্ভীর গলায় বললেন “রুম রিফ্রেশনার দিচ্ছে দেখলাম, এক্কেবারে সস্তা। আমাদের চাটগা ভাষায় একটা কথা আছে বুঝলেন বাবার ফুয়াদ নাই সাম ফুয়াদ খান সাফা দাড়ি। এ হল সেই”।
চান্দ্রেয়ী ফ্যাকাসে মুখে বসে আছে। সৌরেন অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন “কী মানেটা বললেন? বুঝলাম না”।
ভদ্রলোক চান্দ্রেয়ীর দিকে একবার তাকিয়ে বললেন “চলুন বাইরে গিয়ে দাঁড়াই একটু”।
মালিনী ফিরে এসেছিলেন। সৌরেন উঠলেন। মালিনী বললেন “খাবার তাড়াতাড়ি দেবে, বেশি দূর যেও না”।
সৌরেন উত্তর দিলেন না। কাঁচের দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে ভদ্রলোক বললেন “কথাটার মানে হল বাবার পোঙায় চামড়া নেই, আর ছেলে চাপদাড়ি রেখেছে”। বলে ভদ্রলোক অপ্রকৃতিস্থের মত হো হো করে হেসে উঠলেন।
সৌরেন হাঁ করে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।
পাগল নাকি?

৭

সন্ধ্যে ছ'টা বাজে। যদিও বাইরে সন্ধ্যে হবার বিন্দুমাত্র আভাস নেই। দিনের আলো যথেষ্ট। যত পশ্চিমে যাওয়া হচ্ছে, সূর্যাস্ত তত দেরী করে হবে।
ট্রেন চলছে।
শুভায়ু ঘুমাচ্ছে। তন্ময় মোবাইলে গেম খেলছে।
বাপ্পা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। ঋজু চান্দ্রেয়ীকে মেসেজ করে উত্তর না পেয়ে বাপ্পার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।
বাপ্পা বলল “মেয়েটা এখনও কোথাও ফোন করল না?”
ঋজু বলল “আমাদের কী? দিল্লি ন'টা সাড়ে ন'টায় পৌঁছে যাব। তখন নেমে যাবে। আমাদের তো লোড নেবার কোন দরকার নেই”।
বাপ্পা গম্ভীর হয়ে বলল “মেয়েটার মুখটা খুব ইয়ে... দেখলেই কেমন হু হু করে”।
ঋজু অবাক হয়ে বাপ্পার দিকে তাকিয়ে বলল “এসব আবার কখন থেকে শুরু হল?”
বাপ্পা রেগে গেল “শুরু হবার কী আছে? পরের কথা ভাবতে হবে না?”
ঋজু বলল “দুপুরেই তো বলছিলি এসব ট্র্যাপ হতে পারে না কী সব! এই ইয়ে টিয়ে কী বলছিস তুই?”
বাপ্পা বলল “ভাবতে হবে তো। মেয়েটা তো আমাদের বিশ্বাস করছে তাই না? দেখ যারা ফ্রড করে তারা তো তোকে খাবার খাইয়ে করে। মেয়েটা তো আমাদের কিছু খাওয়াচ্ছে না। বরং আমরা যা কিনে দিয়েছি

তাই খেয়ে নিচ্ছে। আমাদের বিশ্বাসও করছে। তাছাড়া তুই তো ছেলেটাকে দেখেছিস। হতেই পারে ঘটনাটা সত্যি, ছেলেটা চাপ নিতে না পেরে পালিয়েছে"।
ঋজু বলল "দেখ ভাই, যাই হোক না কেন, বেশি চাপ নেওয়ার দরকার নেই। নেমে যাবে, আমরাও বাঁচব, ব্যস"!
বাপ্পা বলল "সে তো তুই বলবিই। তোর ফোকাস তো আর এখানে নেই। তোর মন পড়ে আছে চান্দ্রেয়ীর কাছে"।
ট্রেন আলিগড়ে দাঁড়াল।
দুজনে প্ল্যাটফর্মে নামল। ঋজু বলল "তো তোর দাবীটা কী ঠিক? খুলে বল, শুনি"।
বাপ্পা কাঁধ ঝাঁকাল, "আমার কোন দাবী নেই। আমার কী বলার আছে? আমি বলছি শুধু মেয়েটার কথা আমার মিথ্যে লাগছে না"।
ঋজু বলল "ভাল তো। ট্রেন দিল্লি দাঁড়াবে, মেয়েটা নেমে যাবে ব্যস। সারাদিন স্নান করি নি, ভীষণ গরম লাগছে এমনিতেই, চান্দ্রেয়ীর মেসেজও ইরেগুলার হয়ে গেছে, এখন দয়া করে আর এসব ঝামেলা মাথায় নিস না"।
তন্ময় নেমে এল। তাদের দেখে বলল "ভুল হয়ে গেছে জানিস তো। ট্রেন টুন্ডলায় যখন দাঁড়িয়েছিল, দৌড়ে গিয়ে ওয়েটিং রুম থেকে স্নান করে চলে এলে হত"।
বাপ্পা বলল "ট্রেন ছেড়ে দিলে টুন্ডলায় খালি গায়ে জাঙ্গিয়া পরে দাঁড়িয়ে থাকতিস? আবালের মত কথা বলিস না তো! এমনিতেই ঝাঁট ফাট জ্বলে আছে!"
তন্ময় অবাক হয়ে বলল "কেন? ঝাঁট জ্বলে আছে কেন? কী হয়েছে?"
ঋজু তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলল "মামার এখন মামণিকে ইয়ে লাগছে"।
তন্ময় বড় বড় চোখ করে বাপ্পার দিকে তাকিয়ে সুর করে কেটে কেটে বলল "বো কা চো আমার!!! ভেতরে ভেতরে যে প্যার কী গঙ্গা বইছে সে তো ভাবতেই পারি নি!"
বাপ্পা রেগে গেল "এতটাও ফ্রাস্ট্রু অবস্থা না আমার। আমি মানবিকতার দিক থেকে বললাম ব্যাপারটা"।
তন্ময় বলল "মানবিকতা মারিও না বুঝেছো? ওরকম মানবিকতা মারাতে গেলে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মারানো যায়। চেনো না জানো না একটা মেয়েকে, ম্যাক্সিমাম নিজেদের খাওয়ার থেকে ভাগ দেওয়া যেতে পারে ব্যস। এর বেশি কিছু ভাবিস না, হাম্পু হয়ে যাবে পুরো"।
ঋজু তন্ময়কে বলল "আমার মনে হয় মেয়েটাকে বলা যেতে পারে এবার ওর পিসিকে ফোন করুক। দিল্লির পরেও যদি আমাদের সঙ্গে যায়..."
ট্রেনটা নড়ে উঠল। তিনজন তড়ি ঘড়ি ট্রেনে উঠল। বাপ্পা একটু রাগী গলায় বলল "আমিই বলছি। এখনই বলছি"।
ঋজু বাপ্পার হাতে একটু চাপ দিল "বেশি খারাপ ভাবেও বলতে হবে না। দাঁড়া দাঁড়া"।
বাপ্পা বলল "কী হল?"
ঋজু বলল "আমি বলছি। তোকে বলতে হবে না। তুই তো মাঝামাঝি কিছু বলতে পারিস না। হয় দুর্ব্যবহার করে ফেলিস নইলে বেশি ভাল ব্যবহার করে ফেলিস"।
বাপ্পা বলল "বল। আমার কী? আমি মানবিকতা..."
তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বাপ্পা চুপ করে গেল।
সিটে বসে ঋজু খানিকক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল। মেয়েটা এক ভাবে বসে আছে। একটু গলা খাকড়িয়ে ঋজু মেয়েটাকে বলল "আপনাকে কি ও একবারও ফোন করে নি?"
মেয়েটা বিহ্বল চোখে তাদের দিকে তাকাল। তারপর বলল "না। ফোন অফ"।
ঋজু বলল "আপনি বরং এবার আপনার পিসিকে ফোন করে নিন"।

মেয়েটা ঋজুর দিকে তাকিয়ে বলল “হ্যাঁ। করছি”।
ব্যাগ থেকে মোবাইল বের করল মেয়েটা। বেশ কয়েকবার একটা নাম্বারে ডায়াল করে বলল “ফোন ধরছে না”।
ঋজু বাপ্পার দিকে তাকাল। বাপ্পা বলল “ঠিকানা জানেন কোথায় পিসির বাড়ির? আপনি বাড়িতেও ফোন করতে পারেন”।
মেয়েটা বলল “বাড়িতে গেলে মেরে ফেলবে আমায়”।
বাপ্পা হাসবার চেষ্টা করল “ধুস, তা হয় নাকি? ওরম মনে হয়”।
মেয়েটা বাপ্পার দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল “আপনি আমার বাবাকে চেনেন না বলে বলতে পারলেন”।
বাপ্পা ঋজুর দিকে তাকিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল “তাহলে আপনি পিসির বাড়িতেই যান”।
মেয়েটা বলল “আমার কালকা অবধিই টিকিট আছে”।
ঋজু অবাক হয়ে বলল “কিন্তু আপনার তো দিল্লিতে পিসির বাড়ি, কালকাতে না”!
মেয়েটা উত্তর দিল না। জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল।
তন্ময় রাগী রাগী মুখে বাপ্পা আর ঋজুর দিকে তাকাল।

৮
রাত সাড়ে দশটা।
দিল্লি স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়েছে। পুরনো দিল্লি স্টেশন। কামরার অর্ধেক ফাঁকা হয়ে গিয়ে নতুন যাত্রীরা উঠেছে। সৌরেন প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়িয়েছেন।
পাশের ভদ্রলোক এসে খুশি খুশি মুখে বললেন “এবার মনের সুখে টুইট করে দিয়েছি। ইঁদুর, ট্রেন লেট, বাথরুম অপরিষ্কার, সব। দেখবেন সব সিধা হয়ে যাবে”।
সৌরেন হাসি হাসি মুখে ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন। ট্রেন জার্নিতে মাঝে মাঝে অনেক বন্ধু জুটে যায়। আর মাঝে মাঝে জোটে এই ধরণের পাবলিক। একা একাই কথা বলে যাবে, বিরক্তিকর জার্নিতে এরকম বিরক্তিকর লোক সঙ্গে থাকলে মাথায় রক্ত উঠে যায়।
ভদ্রলোককে একপ্রকার অগ্রাহ্য করেই ফোন বের করে সাইড হলেন। তনয়াকে ফোন করলেন। ফোন রিং হয়ে গেল। ধরল না তনয়া।
সৌরেনের বিরক্তি বাড়ল।
খানিকটা হেঁটে একটা দোকান থেকে খবরের কাগজ কিনলেন। ট্রেন দিল্লিতে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়।
রাতে প্যান্ট্রির খাওয়ার খেতে হবে ভেবেই বিরক্ত লাগছিল তার।
এরা যে কী করে এরকম টেস্টলেস খাবার বানাতে পারে সেটা নিয়ে গবেষণা হওয়া উচিত। কোন খাবারেই স্বাদ নেই। ঝোল বানিয়ে তার মধ্যে সাদা সাদা পনীর ছেড়ে দিয়েছে।
ফোনটা বেজে উঠল। তনয়া। সৌরেন ধরলেন “ফোন ধরছিলে না কেন?”
তনয়া বললেন “রান্না করছিলাম। বল কী বলবে?”
সৌরেন বললেন “যেটা কাল বলছিলে সেটা পুরোটা বল”।
“কোনটা বলত?”
সৌরেন বিরক্ত গলায় বললেন “এমন ভাব করছ যেন কিছুই বুঝতে পারছ না। যেটা মামণের ব্যাপারে বললে কালকে, সেটা বল”।
“ওহ। যা বলার তো বলে দিয়েছি। এবার তুমি সামলাও”।
“আমি তো অর্ধেক জেনে কোন ভাবেই সামলাতে পারব না। তুমি দয়া করে খোলসা করে বল কী কী জান”। সৌরেন অধৈর্য হচ্ছিলেন।

তনয়া হাসতে হাসতে বললেন "শোন, বেড়াতে গেছ যখন তখন ঠান্ডা মাথায় থাকো। ফিরে এসে সামলিও বরং সব কিছু। তখন বলব। আমিও বুঝতে পারি মালিনীকে সারাক্ষণ সামনে দেখে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কী করবে বল, তুমি তো আর আমাকে নিয়ে যাও নি, ওকেই নিয়ে গেছো"।
সৌরেন বললেন "আমি ফিরেই যা করার করব, কিন্তু তুমি যে বললে ছেলেটা এই ট্রেনেই যাচ্ছে সেটা কি ঠিক?"
"তা ঠিক। অল্প বয়সের প্রেম। শরীরের ছোঁয়া পেয়ে গেছে। এখন কি আর কাছছাড়া করতে চায়"? তনয়া ইঙ্গিতপূর্ণ সুরে কথাটা বললেন।
সৌরেন ফোনটা কেটে দিলেন। তনয়া মাঝে মাঝে নিজের মাত্রাটা হারিয়ে ফেলে।
দাঁতে দাঁত চিপে তনয়ার উদ্দেশ্যে "ব্লাডি বিচ" বলে সৌরেন ট্রেনে উঠলেন।
তনয়া আবার ফোন করছিল। সৌরেন ধরলেন না।
মালিনী শুয়ে আছে, চান্দ্রেয়ী মোবাইল ঘাটছে।
সৌরেন চান্দ্রেয়ীর দিকে একবার তাকালেন। ঠিক করলেন এখন আর কিছু বলবেন না।
মালিনী বললেন "কাল ক'টায় নামব আমরা?"
সৌরেন বললেন "ট্রেন লেট যাচ্ছে। একদিকে শাপে বর। রাত থাকতে থাকতে নামতে হবে না"।
মালিনী বললেন "তোমরা খেয়ে নাও। আমার আর খেতে ইচ্ছা করছে না"।
সৌরেন বললেন "আমিও খাব না"।
মালিনী মেয়ের দিকে তাকালেন "তুই খেয়ে নে"।
চান্দ্রেয়ী বলল "আমারও খিদে নেই"।
সৌরেন মেয়ের দিকে তাকালেন "খেয়ে নে। সকালে ব্রেক ফাস্ট কখন করব, কোন ঠিক নেই"।
চান্দ্রেয়ী বাবার দিকে একবার তাকিয়ে ট্রেনের খাবারের প্যাকেটগুলো খুলল।
সৌরেন নিজের আপার বার্থে উঠলেন। তনয়া মেসেজ করেছে "হাজার দশেক টাকা আরও লাগবে, কাল পাঠালে ভাল হয়"।
ভ্রু খানিকটা কুঁচকাল তার। তনয়াকে যা টাকা দেবার দিয়ে এসেছিলেন তিনি। দিন যত যাবে তাদের সম্পর্কটা কি খানিকটা ব্ল্যাকমেলিংএর দিকে এগোবে? মামণের পিছনেই বা গোয়েন্দা লাগিয়েছে কেন তনয়া?
মালিনী বললেন "শোন, একটু খেয়ে নাও। একবারে খালি পেটে থাকাও ঠিক না"।
সৌরেন বললেন "তুমি খাও। আমার ভাল লাগছে না"।
মালিনী বললেন "ভাত খাবে না একটা রুটি খেয়ে যাও"।
সৌরেন আবার নামলেন। মালিনী উঠে বসেছে।
সৌরেন বললেন "প্ল্যানের খানিকটা চেঞ্জ করেছি। আমরা কালকায় নামব না। চণ্ডীগড়ে নামব"।
কথাটা বলেই সৌরেন চান্দ্রেয়ীর দিকে তাকালেন।
চান্দ্রেয়ী একবার বাবার দিকে তাকিয়েই খাওয়ায় মনোযোগ দিল।
মালিনী বিরক্ত গলায় বললেন "এ আবার কখন ঠিক করলে? একেক সময় একেক রকম হলে তো মুশকিল! চন্ডীগড় থেকে সিমলা যাবে?"
সৌরেন মালিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন "হ্যাঁ। এই ঠিক করলাম। এতক্ষণ এটাই দেখছিলাম। গাড়িতেই যখন যাব তখন সরাসরি চণ্ডীগড় নেমেই যাই। আবার একটা জিনিসও করা যায়। সিমলা গেলামই না। মানালি চলে গেলাম আগে"।
মালিনী ব্যাজার মুখে বললেন "যা ইচ্ছা কর। শুধু মনে রেখো, আমাকে বেশি টানা হ্যাচড়া করবে না। আমার এসব পোষায় না একদম"।

সৌরেন বললেন “আমি ডেকে দেব তোমাদের, চিন্তা কোর না”।
চান্দ্রেয়ী চুপচাপ খেয়ে যেতে লাগল। কোন কথা বলল না।

৯

ট্রেন দিল্লি ছেড়ে খানিকক্ষণ আগে। ঋজু শুয়েছে কিন্তু ঘুম পাচ্ছে না। সে মিডল বার্থে শুয়েছে। মোবাইলে চার্জ নেই। ট্রেনের ফোন চার্জের জায়গায় বাপ্পা চার্জে বসিয়েছে। ঋজুর পাওয়ার ব্যাঙ্কের চার্জও ফুরিয়েছে। ঋজুর মনটা খচখচ করছে। কিন্তু বাপ্পার মোবাইল সরিয়ে চার্জে বসালেই গালাগাল খেতে হবে।
ভোরবেলা কালকা পৌঁছে সিমলার বাস ধরার কথা। ঋজু ঠিক করেছে রাত দুটোর দিকে ফোন চার্জে বসাবে। মেয়েটা দিল্লিতে নামে নি। চুপ করে শুয়ে আছে এখন। বেশ খানিকক্ষণ শুয়ে ঋজু যখন বুঝল ঘুম আসছে না, বার্থ থেকে নেমে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। সারাদিনের উত্তপ্তভাবটা একেবারেই নেই এখন। বেশ একটা হিম হিম ভাব। ঠাণ্ডাই লাগছিল তার।
ট্রেনটা হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়ল অন্ধকারের মধ্যে। চারদিকে ধু ধু মাঠ।
ঋজুর হঠাৎ মার জন্য মন খারাপ লাগল। ট্রেনে উঠে একবারও মাকে ফোন করা হয় নি। নিশ্চয়ই চিন্তা করছে।
দরজার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ খেয়াল হল মেয়েটা বাথরুমে যাচ্ছে, তাকে দেখে একটু থমকে দাঁড়িয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল।
মিনিট দুয়েক পরে বেরিয়ে সিটের দিকে এগোচ্ছিল হঠাৎ কী মনে করে তার দিকে ফিরে এসে বলল “একটা কথা বলব?”
ঋজু বলল “বলুন”।
মেয়েটা বলল “তখন শুনছিলাম আপনার সঙ্গে ওর নাকি কথা হয়েছিল, একটু বলবেন প্লিজ, ঠিক কী কথা হয়েছিল?”
ঋজু বলল “সেরকম কিছু না। মানে এখন আমি মনেও করতে পারছি না ঠিক কী বলেছিল। এটুকু মনে পড়ছে বলেছিল আপনি দুর্গাপুরের”।
মেয়েটা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে বলল “আমি জানতাম ও ঠিক পালিয়ে যাবে। ওকে আমার বিশ্বাস করাই ঠিক হয় নি”।
ঋজু এ কথার উত্তরে কী বলবে বুঝতে পারছিল না। মেয়েটা বলল “বাবাকে আমার পিসিরা সবাই ভয় পায়। পিসি ইচ্ছা করেই আমার ফোন ধরে নি। আমি পিসির বাড়ি গেলে ওরা আমাকে ঠিক বাড়ি পাঠিয়ে দিত আবার”।
ঋজু বলল “আপনার তো এখন বাড়ি যাওয়া ছাড়া কোন অপশনও নেই”।
মেয়েটা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল “বাড়ি যাওয়ার সাহস নেই আমার আর। ট্রেনে উঠেই বাবাকে ফোন করে ছিলাম। বাবা কথাটা শুনেই ফোনটা কেটে দিল। একটা কথাও আর বলল না। আমি আমার বাবাকে চিনি। আমি কিছুতেই আর বাড়ি ফিরতে পারব না। সায়ন যে এটা কী করল!”
ঋজু বলল “সায়নের বাড়ি কোথায় জানেন?”
মেয়েটা বলল “না। জেনেই বা কী হত!”
ঋজু বলল “একটা তো কিছু ডিসিশন নিতে হবে আপনাকে, মানে এইভাবে...। একটা মেয়ে একা ঘুরবে এটা সিনেমায় হয়, কুইন সিনেমা! তাও সিনেমাটা বিদেশে বানাতে হয়, এদেশে তো এটা ভাবাই যাবে না তাই না?”
মেয়েটা একটু মরিয়া হয়ে বলল “আমি ঠিক পারব। আমার কাছে বেশ কিছু টাকা আছে, গয়নাও আছে। আপনারা যেখানে যেখানে যাবেন, আমাকে নিয়ে চলুন প্লিজ, আমি টাকা দিয়ে দেব”।

মেয়েটার হঠাৎ এই প্রস্তাবে ঋজু একটু হকচকিয়ে গেল। বলে কী?
মেয়েটা বলল “দেখুন, ঠিক এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। সবটাই অচেনা অজানা...”
ঋজু বলল “আপনার কোন বন্ধু নেই? বা মাসতুতো পিসতুতো দাদা বা কেউ এমন যে অ্যাটলিস্ট এই সময়টা আপনাকে একটা শেল্টার দিতে পারবে?”
মেয়েটা উত্তর দিল না। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজের সিটের দিকে গেল।
ঋজু বুঝল মেয়েটা আহত হয়েছে। বুঝতে পেরেছে তাকে ঋজু বিশ্বাস করছে না।
খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল ঋজু। হঠাৎ দেখল বাপ্পা এসে দাঁড়িয়েছে। গম্ভীর। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে।
ঋজু বলল “কীরে ভাই, কী হল তোর? গ্যাস হয়েছে নাকি?”
বাপ্পা চাপা গলায় বলল “মেয়েটা কী বলছিল তোকে?”
ঋজু বলল “আমাদের সঙ্গে যেতে চায়”।
বাপ্পা গম্ভীর গলায় বলল “তুই কী বললি?”
ঋজু বলল “কী বলব, জিজ্ঞেস করলাম আত্মীয় স্বজন কেউ কি নেই যে দায়িত্ব নিতে পারে, শুনে চলে গেল”।
বাপ্পার নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হচ্ছিল ধীরে ধীরে।
ঋজু হাসল “তুই কি ভাবছিলি আমি লাইন মারছিলাম?”
বাপ্পা বাঁকা গলায় বলল “মারতেই পারিস। আমি দেখেছি যে সব ছেলের গার্ল ফ্রেন্ড থাকে, তাদের আরও জুটতে থাকে। আর যাদের থাকে না তাদের কোনভাবেই থাকে না। তারা পোড়া কপাল নিয়ে জন্মায়”।
ঋজু ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল “তুই এক কাজ কর না, মেয়েটাকে বিয়ে করে নে। ঘোরা হানিমুন সব হয়ে যাবে। চাকরি বাকরি তো এখনও কিছু করিস না। কলকাতায় ফিরে স্বামী স্ত্রী চপের দোকান দিবি। চপশিল্পে লাইফ কেটে যাবে”।
বাপ্পা আবার রেগে গেল। রাগী চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

১০

ভোর সাড়ে চারটে।
তারা চণ্ডীগড় স্টেশনে নেমে গেছেন।
চান্দ্রেয়ীর মুখ ভার। যে কোন সময় কেঁদে ফেলতে পারে।
ঋজুর ফোন কাল রাত থেকেই সুইচড অফ। অনেকবার হোয়াটস অ্যাপে মেসেজ করেছে, ঋজু কোনটাই সীন করে নি। শেষ মেষ বাথরুমে গিয়ে চান্দ্রেয়ী ফোন করে দেখেছে ঋজুর ফোন সুইচড অফ। প্রথমে ভীষণ রাগ হয়েছে। পরে কান্না পাচ্ছে। বাবা জানতে পেরে গেছে ঋজুর কথা। কে বলতে পারে?
চান্দ্রেয়ী কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না বাবা এত কিছু কী করে জেনে গেল। যখন থেকে জানতে পেরেছে বাবা জেনে গেছে, তখনই সে বুঝে গেছে বাবা এত সহজে সব কিছু ছেড়ে দেবে না। বাবা ভীষণ একরোখা টাইপের লোক। ঋজু জানে তারা কালকা নামবে। নিশ্চয়ই নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে এখন। চান্দ্রেয়ীর চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছা করছিল।
চণ্ডীগড়ে ভোরের দিকে বেশ ঠান্ডা পড়ে। এই সময়টা আসলে শীতটা সবে ছেড়েছে, গরম এখনও পড়ে নি। এদিকে ভোর রাত্রে শীতের মনে পড়ে যায় এখনও একটু ডিউটি দেওয়া বাকি। তাই গুটি গুটি মানুষকে ঠান্ডা লাগাতে হাজির হয়ে যাচ্ছে।
মালিনী ব্যাগ থেকে শাল বের করে গায়ে জড়িয়ে নিয়েছেন। চান্দ্রেয়ীকে বলেছেন তবে চান্দ্রেয়ী শোনে নি। তার মাথা গরম আছে। এখন ঠান্ডা লাগবে না।

একজন কুলি তাদের মাল নিয়ে এগিয়ে চলেছে ওভারব্রিজের দিকে। তার পেছন পেছন সৌরেন, মালিনী আর চান্দ্রেয়ী যাচ্ছে। কালকা মেলের বগি বেশ কয়েকটা কেটে যায় চণ্ডীগড়ে।
তাদের বগির পরের বগিগুলোই কেটে নিয়ে গেল চান্দ্রেয়ী দেখতে পেল। সে বারবার প্রার্থনা করে যাচ্ছে ঋজু যেন তাদের দেখতে পায়। প্ল্যাটফর্মে ভালই ভিড়। চান্দ্রেয়ী এদিক ওদিক অনেকবার তাকিয়েও ঋজুকে দেখতে পেল না। ওভারব্রিজ পেরিয়ে তারা পার্কিঙ লটে চলে এল।
একজন ট্রাভেল এজেন্টকে আগেই ফোন করে দিয়েছিলেন সৌরেন, সে চলে এসেছে। বেশ সুদর্শন লম্বা একজন যুবক। যোগিন্দর নাম। সৌরেনকে দেখে আধভাঙা বাংলাতেই বলল "সিমলা যাবেন তো?"
সৌরেন বললেন "সিমলা কতক্ষণ লাগবে?"
যোগীন্দর ঘড়ি দেখে জানাল সাড়ে আটটা থেকে ন'টা বেজে যাবে।
সৌরেন একবার চান্দ্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে যোগিন্দরের দিকে তাকালেন "আমি ভাবছি জার্নি রুটটা চেঞ্জ করে ফেলব। আগে ডালহৌসি গেলে কেমন হয়?"
যোগিন্দর খানিকক্ষণ হাঁ করে সৌরেনের দিকে তাকিয়ে জানাল সেক্ষেত্রে আগে অমৃতসরে নামলেই ভাল করত। সৌরেন বললেন "আহা, বল না কতক্ষণ লাগবে?"
যোগিন্দর ঘড়ি দেখে টেখে জানাল "একটা বেজে যাবে। বেশিও হতে পারে"।
সৌরেন বললেন "একটা? ধুস! ও তো ভর দুপুর! ডালহৌসিই যাব আগে"।
যোগিন্দর একবার মালিনীর ক্লান্ত এবং বিরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে জানাল একটা বাজবে যদি সরাসরি কোথাও না থেমে যাওয়া যায়। নইলে আড়াইটা তিনটেও বেজে যেতে পারে।
সৌরেন মাথা নাড়লেন "তাহলে এক কাজ করা যাক, তুমি তো বললে অমৃতসরে নামলেই ভাল হত?"
যোগিন্দর হ্যাঁ বলল।
সৌরেন বললেন "তাহলে আমরা আগে অমৃতসর চলে যাই"।
যোগিন্দর কয়েকসেকেন্ড সৌরেনের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বলল "জ্যায়সে আপ কহে"।
মালিনী সৌরেনের উদ্দেশ্যে বললেন "ঠিক করলে কোথায় যাব? তোমার এই পাগলামি আবার শুরু হল?"
সৌরেন যোগিন্দরের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন "তোমার ড্রাইভারকে বল গাড়িতে সামান তুলতে। আজ আমরা অমৃতসরে থাকব। কাল সকালে ডালহৌসি রওনা দেব। যারা ঘুরবে তারা একটু অ্যাডভেঞ্চারাস হবে না, কী বল?"
সৌরেন মালিনীর দিকে তাকালেন। চান্দ্রেয়ী বুঝল বাবা শেষ কথাটা তাকেই শুনিয়েছে।
একটা টয়োটা ইনোভা গাড়ি। সব মালপত্র গাড়ির ছাদে তুলে বাঁধা হল। যোগীন্দর জানাল চণ্ডীগড় থেকে অমৃতসর পাঁচ ঘণ্টা লেগে যাবে।
মালিনী খানিকটা গজগজ করতে করতে বললেন "ড্রাইভারকে বলে দাও একটা ভাল দেখে কোন জায়গায় দাঁড়াতে"।
সৌরেন বললেন "এখনই দাঁড়াবে?"
মালিনী বললেন "না, বলব। কোথায় ভাবলাম সিমলা যাব, তা না, কী সব শুরু করলে। অমৃতসরে কি ঠান্ডা হবে?"
সৌরেন মাথা নাড়লেন "রোদ উঠলেই গরম?"
মালিনী বললেন "তোমার মাথায় কখন কী ওঠে বলত? দিব্যি তো সিমলা যাবার কথা ছিল। এর মধ্যে এরকম উল্টো পালটা শুরু করলে কেন?"
চান্দ্রেয়ী চোখ বন্ধ করে বসে ছিল। তার আর কিছু শুনতে ইচ্ছা করছিল না।
গাড়ি চলতে শুরু করল। সৌরেন ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন।
ড্রাইভার অবশ্য বাংলা বোঝে না। হিন্দিতেই কথা হচ্ছিল। চান্দ্রেয়ী ফোনটা বের করে ঋজুকে হোয়াটস

অ্যাপে মেসেজ করল “অমৃতসর যাচ্ছি। সিমলা না। বাবা সব জানতে পেরে গেছে”।
সৌরেন বেশ খানিকক্ষণ কথা বলতে বলতে হঠাৎ ড্রাইভারকে বলে বসলেন “সিমলাই চলিয়ে। মাইন্ড চেঞ্জ হো গয়া”।
ড্রাইভার গাড়ি রাস্তার বা দিকে দাঁড় করিয়ে উত্তেজিতভঙ্গীতে নেমে গেল। ফোন বের করে সম্ভবত যোগীন্দরকেই ফোন করতে শুরু করল। মালিনী চান্দ্রেয়ীকে বিরক্ত গলায় বললেন “ফেরার পথে মনে হচ্ছে তোর বাবাকে রাচীতে নামিয়ে দিয়ে যেতে হবে”।
কয়েক মিনিট পরে ড্রাইভার বেশ রাগী রাগী মুখে গাড়িতে এসে বসল।
সৌরেন একটুও না রেগে হাসি হাসি গলায় বললেন “এক গানা চালাও তো। রফিওয়ালা”।

১১

ভোর সাড়ে ছ’টা। কালকা স্টেশনে সব মাল পত্র নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। ঋজু মোবাইল অন করেছে একটু আগে। তার মাথার ঠিক নেই। বাসের খবর নিতে যাচ্ছে বলে বেরিয়েছে এখনও ফেরেনি।
বাপ্পা একটু আগে মেয়েটির নাম জানতে পেরেছে। বাঁধন।
বাঁধন চুপ করে স্টেশনেই বসে আছে।
বাপ্পা বাঁধনের ধারে কাছে ঘুর ঘুর করছে।
তন্ময় আর শুভায়ু ঘুম ঘুম চোখে স্যুটকেসের ওপর বসে। মনে হচ্ছে যে কোন সময় ঘুমিয়ে পড়তে পারে।
বাপ্পা উশখুশ করতে করতে বাঁধনের কাছে গিয়ে বলল “দেখেছেন ঋজুটা কখন গেল কোন খবর নেই”।
বাঁধন অন্যমনস্কভাবে বলল “ফিরবে, ঠিকই ফিরবে”।
বাপ্পা গম্ভীর হয়ে গলা খাকড়ে বলল “হ্যাঁ, সে তো ফিরবেই। ঋজু তো আর হলুদ পাখি না, যে ফিরবে না আর কোন দিন”।
বাপ্পা ভেবেছিল তার এই কথায় বাঁধন হাসবে, বাস্তবে দেখা গেল বাঁধন উত্তরও দিল না।
সে খানিকটা মনমরা হয়ে তন্ময়ের স্যুটকেসে বসল।
তন্ময় বসে বসে ঢুলতে ঢুলতে বলল “ঋজুকে ফোন কর। মাল যদি ওই মেয়েটার বয়ফ্রেন্ডের মত পালিয়ে যায় তাহলে আমাদের ট্যুরের হাতে হ্যারিকেন হয়ে যাবে”।
বাপ্পা গলা নামিয়ে বলল “গালাগালি দিস না। মেয়েটা শুনতে পাবে”।
তন্ময় চোখ খুলে ঘুম চোখে বাপ্পার দিকে তাকিয়ে বলল “লাভ নেই মামা, এভাবে মেয়ে ওঠে না”।
বাপ্পা আগুনে চোখে তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল “এক লাথ মারব। চুপচাপ থাক”।
তন্ময় ফিকফিক করে হাসতে হাসতে শুভায়ুর পেটে খোঁচা মারল। শুভায়ুও ঢুলছিল।
খোঁচা খেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বলল “লিলুয়া এসে গেছে?”
তন্ময় শুভায়ুর দিকে তাকিয়ে বলল “এই যে হাওড়া লাইনের মাল আওকাত দেখিয়ে দিয়েছে। বেড়াতে এসেছ তুমি ভুলে গেলে হবে বাওয়া?”
শুভায়ু ভাল করে চোখ ডলে বলল “পাওয়ার ন্যাপ নিচ্ছিলাম ভাই। চাপ নিস না। প্ল্যান কী আমাদের? স্টেশনেই ভিক্ষা করতে থাকব নাকি?”
বাপ্পা দাঁত খিচিয়ে বলল “ঋজু যখন বাসের খোঁজ নিতে গেল তখন গেলি না কেন? এখন বাতেলা মারলে হবে?”
শুভায়ু বলল “ঋজু সময় দিলে তো! আমি দেখছি বলে কোথাও হাপিশ হয়ে গেল।”
বাপ্পা আড়চোখে বাঁধনের দিকে তাকিয়ে তন্ময়কে বলল “ঋজুকে ফোন কর। মালটার খোঁজ নে”।
তন্ময় বলল “কেন, তোর ফোনের কি কার্বাংকল হয়েছে? নাকি মোদী তোকে ফোন করতে বারণ করেছে? তুই কর”।

বাপ্পা রেগে গিয়ে বলল “করতে হবে না কারও। এখানেই বসে থাক”।
তন্ময় পকেট থেকে ফোন বের করল “সব সময় অর্ডার দিবি না বুঝলি বাপ্পা। তোর মধ্যে লিডারশিপ কোয়ালিটি একেবারেই নেই। হতে চাস নেতাজী আর হয়ে যাস মদন মিত্র”।
বাপ্পার গালাগাল দিতে ইচ্ছা করছিল। বাঁধন কাছাকাছি ছিল বলে মুখ খুলল না।
তন্ময় ঋজুকে ফোন করল। ঋজু ধরল না। তন্ময় বলল “এই মরেছে, হীরো আলম গেল কোথায়?”
শুভায়ু বলল “আরে এসে গেছে, ঐ দিকে দেখ”।
ঋজু গম্ভীর হয়ে তাদের দিকেই আসছিল। বাপ্পা উঠে দাঁড়াল, “কী বে,কোথায় চলে গেছিলি?”
ঋজু এসে বলল “বাসে যেতে হবে না। একটা সুমো ঠিক করে এলাম, গাড়িতে চ”।
সবাই এর ওর মুখ চাওয়া চাউয়ি করল। বাপ্পা বলল “মাথা খারাপ তোর? গাড়ির টাকা কোত্থেকে পাব ভাই? পকেট তো মিয়া মালকোভার মত হাঁ করে আছে!”
ঋজু বলল “আমি দিয়ে দিচ্ছি। পরে কলকাতা ফিরে দিয়ে দিস”।
তন্ময় বলল “কেন ভাই? ছামিয়া কি চুম্বকের মত নিজের দিকে টানতে শুরু করে দিয়েছে তোর?”
ঋজু বলল “ওরা চন্ডীগড়েই নেমে গেছে। আর এই বাপ্পা গান্ডুটা সারারাত নিজের মোবাইল চার্জ দিল বলে আমি ফোন শেষরাতের আগে চার্জই দিতে পারলাম না”।
বাপ্পা হাওয়া গরম বুঝে সাইডে সরে গেল।
ঋজু বলল “চ, মাল নিয়ে পার্কিঙের দিকে চ”।
সবাই ব্যাগপত্তর নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বাঁধন ওখানেই বসে থাকল।
বাপ্পা তাড়াতাড়ি এসে ঋজুকে বলল “বাঁধন যাবে না?”
ঋজু বলল “আমি কী জানি?”
বাপ্পা বলল “ওর টাকা আমি দিয়ে দেব, ওকে নিয়ে চ ভাই”।
ঋজু উত্তর না দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। বাপ্পা ওর পেছন পেছন আসতে আসতে বলল “বল না ভাই, বলব? কী রে?”
ঋজু খানিকটা এগিয়ে গেছিল। এবার ব্যাগটা রেখে নিজেই বাঁধনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল “সিমলা গেলে আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন। একটা গাড়ি বুক করেছি”।
বাঁধন ঋজুর দিকে চমকে তাকাল কয়েক সেকেন্ড। তারপর উঠে দাঁড়াল।
বাপ্পা দাঁত বের করে হাসল।
তন্ময় বাপ্পার কানে কানে বলল “বাপ্পা দাঁত মেজে নিস। ওপর আর নিচের তাকে যা হলুদ আছে, সানরাইজ হলুদও অত হলুদ না”।
বাপ্পা রেগে মেগে নিজের ব্যাগ নিয়ে জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করল।

১২

গাড়িটা একটা রেস্তোরাঁয় দাঁড়িয়েছে। পাহাড় শুরু হয়ে গেছে ঘন্টাখানেক আগেই।
মালিনী গাড়ি থেকে নামতে নামতে চান্দ্রেয়ীকে বললেন “আমার ওষুধের বাক্সটা নিয়ে নামিস। খাওয়ার আগে একটা ওষুধ আছে। উফ, পাহাড়ে উঠতে শুরু করলেই আমার কান বন্ধ হয়ে যায়”।
সৌরেন বললেন “কী খাবে?”
মালিনী বলল “রুটি। পরোটা খাব না। তবে আগে বাথরুমে যাব। তুমি এসো আমাদের সঙ্গে”।
বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে তারা টেবিলে বসলেন।
ড্রাইভার আলাদা বসে গেছে আলুপরোটা আর আচার নিয়ে। এইসব হোটেলের সঙ্গে ড্রাইভারদের কানেকশন থাকে, সর্বক্ষণ যাতায়াত তো লেগেই থাকে ট্যুরিস্টদের নিয়ে। মুখের কথা না খসতেই তাদের

খাবার চলে আসে।
সৌরেন অর্ডার করে বললেন "খুব একটা শীত নেই।"
মালিনী বললেন "স্টেশনে নেমে যেন বেশি ঠান্ডা লাগছিল"।
চান্দ্রেয়ী মাথা নিচু করে মোবাইল দেখল। ঋজু পরপর মেসেজ করেছে। তার মাথা গরম হয়েছিল। সে রিপ্লাই দিল না।
সৌরেন বললেন "আমাদের এক কলিগের মেয়ে বুঝলে, পালিয়ে বিয়ে করেছে"।
চান্দ্রেয়ী চমকাল না। সে এরকমই কিছু একটা আশা করছিল।
মালিনী বললেন "কে?"
সৌরেন বললেন "চিনবে না"।
মালিনী রেগে গিয়ে বললেন "তোমার কোন কলিগকে আমি চিনব না?"
সৌরেন বললেন "সে আছে। কেসটা হল মেয়েটা একটা লাফাঙ্গা টাইপ ছেলের সাথে পালিয়েছে। লাথখোর। খুব কান্নাকাটি করছিল ওর বউ। আমি তো পরিষ্কার বলেই দিলাম কলিগকে। মেয়েকে ত্যাজ্য করে দাও। আর ছেলেটাকে পাতি ভাড়াটে খুনী দিয়ে উড়িয়ে দাও"।
মালিনী অবাক হয়ে বলল "এ কেমন কথা বলছ? খুন টুন আবার কেন? তুমিই বা ওদের এসব বলতে গেলে কেন? দুদিন পরে যখন আমে দুধে মাখামাখি হবে, তখন যে আটি গড়াগড়ি খাবে, তার বেলা?"
সৌরেন বললেন "আমি হলে আমে দুধে কখনই মাখামাখি হবে না এ কথা তোমাকে বলে দিতে পারি। অনেক কষ্ট করে মেয়ে মানুষ করতে হয়। মেয়ে তা না বুঝলে আমি কিন্তু সহ্য করব না। একটা মেয়ের বাবার মাথার মধ্যে কী কী চিন্তা থাকে সেটা আমিই বুঝতে পারি"।
মালিনী বিরক্ত হয়ে বললেন "তুমি থামো তো! বেড়াতে এসে কোথায় ভাল ভাল কথা বলবে তা না! শুধু অলুক্ষুণে কথা। মামণ কি আমাদের সেরকম মেয়ে নাকি?"
খাবার এসে গেল। তন্দুরি রুটি আর আলুর কিছু একটা তরকারি। চান্দ্রেয়ী তড়িঘড়ি খাবার নিয়ে খেতে শুরু করল।
সৌরেন রুটি নিজের প্লেটে নিতে নিতে বললেন "কে জানে, সারাক্ষণ তো এসব নিয়েই চিন্তা হয় আমার আজকাল"।
মালিনী বাঁকা সুরে বললেন "হ্যাঁ, তোমার তো মামণের চিন্তায় ঘুমই হচ্ছে না! এমন কর না! থামো তুমি!"
সৌরেন গম্ভীর মুখে খেতে শুরু করল।
চান্দ্রেয়ী মোবাইল বের করে হাতে নিল। সৌরেন সামনা সামনি বসেছেন। চান্দ্রেয়ী টেবিলের তলায় বা হাতে মোবাইলটা দেখল।
"তোমার বাবা জানল কী করে?"
এই কথাটাই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বার পাঁচেক লেখা।
চান্দ্রেয়ী একটা রাগী ইমোটিকন দিয়ে খেতে থাকল।
মালিনী বললেন "শোনো, ড্রাইভারকে বলে দেবে, রোজ যেন সকাল ন'টা দশটার আগে না বেরোতে হয়। এই জন্যই কিন্তু আমরা কন্ডাক্টেড ট্যুরে আসি নি! ভোরবেলা ওঠার ঝক্কি আমি নিতে পারব না"।
সৌরেন বললেন "সে বলে দেব। ওসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে না"।
মালিনী বললেন "উফ, গতবার সাউথ ইন্ডিয়া গিয়ে যা অবস্থা হয়েছিল! ওভাবে কেউ ঘোরে!"
সৌরেন বললেন "বললাম তো, সেসব নিয়ে ভাবতে হবে না। সিমলা পৌঁছে আমি রুট ম্যাপটা ঠিক করে নেব"।
মালিনী বললেন "তুমি ঠিক করবে রুটম্যাপ? তাহলেই হয়েছে। সেটা যে কত লক্ষবার চেঞ্জ হবে বরং সেটা ঠিক কর"।

সৌরেন বললেন “সকালে অ্যাটলিস্ট যাব না। নিশ্চিন্ত থাকো”।
মালিনী গজগজ করতে থাকলেন।
খেয়ে দেয়ে গাড়িতে উঠে বসলে গাড়ি স্টার্ট দিল।
চান্দ্রেয়ী দেখল ঋজু আবার লিখেছে “তোমার বাবা জানল কী করে?”
-আমি কী করে জানব? গম্ভীর হয়ে আছে। আর শোন...
-বললাম তো চার্জ...
-না। আমি অন্য কথা বলছিলাম।
-হু।
-তোমার একা আসা উচিত ছিল। এইসব ল্যাওঙাট না আনলেই পারতে।
-একা? মাথা খারাপ তোমার? এত দূর একা ছাড়বে বাড়ি থেকে?
-তাহলে এইসব জঞ্জাল না এনে একজন ভাল কাউকে আনলেই পারতে।
-আরে এরা খারাপ তোমাকে কে বলল?
-খারাপ না তো কী? চার্জ দিতে দেয় না কেন? যদি সত্যিই অমৃতসর চলে যেতাম তখন তুমি কী করতে?
-আমি আবার কী করব!
-হু। সেই তো। এখন কোথায়?
-কালকা ছাড়ল।
-হোটেল ঠিক করে রাখা?
-কিছুই না। তোমার হোটেল কোনদিকে বলে দাও, কাছাকাছি খুঁজব।
-দেখছি। গিয়ে পৌঁছাই আগে। এখন তো ব্রেকফাস্ট করে বেরোলাম আবার।
-ওকে।
-কী ওকে ওকে করছ? এত তাড়া কিসের? আমি টাইপ করতে পারছি...
-ওসব কিছু না, পাশে বাপ্পাটা ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছে।
-ওই জন্যই তো ভাল লোকের কথা বললাম।
বিরক্ত লাগছিল চান্দ্রেয়ীর। সে ফোনটা বন্ধ করে ব্যাগে ঢুকিয়ে দিল।

১৩

গাড়ি সিমলা শহরে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে আছে একটা পার্কিঙ প্লেসে।
ড্রাইভার জানিয়েছে মাঝে মাঝে বাইরের গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখে। পুলিশের কাছে গিয়ে জানা গেছে বেলা বারোটা অবধি দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।
শুভায়ু আর তন্ময় ঘুম থেকে উঠেছে খানিকক্ষণ আগে। শুভায়ুর ঘুম ভাঙার পর বমি হয়েছে একবার। তড়িঘড়ি গাড়ি দাঁড় করিয়ে খাদের ধারে বমি করেছে। ঘাড়ে মাথায় জল দিয়ে পেছনের সিটে টান হয়ে শুয়ে আছে।
বাপ্পা আর ঋজু গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। বাঁধন গাড়িতেই বসে আছে।
বাপ্পা বলল “হ্যাঁ রে ঋজু হোটেল তো ঠিক করা হয় নি এখনও। ড্রাইভারকে বলে দেখবি?”
ঋজু বলল “ম্যালের কাছেই দেখতে হবে”।
বাপ্পা বলল “ওখানে গেছে তোর ইয়ে?”
ঋজু গম্ভীর গলায় বলল “হু। এবার কী করবি?”
বাপ্পা বলল “কী করব?”
ঋজু বলল “বাঁধনের জন্য আলাদা ঘর নিতে হবে। ও তো আর আমাদের সাথে শুতে পারবে না”।

বাপ্পা সিরিয়াস মুখে বলল “বিয়ের কথা বলে দি?”
ঋজু রেগে গেল “দেখ বোকাছেলে, এখানে আমি খিল্লি করতে আসি নি। সিরিয়াস কারণে এসেছি। আর ওর বাবাও সব জেনে গেছে সুতরাং আমি যথেষ্ট টেনশনে আছে। সমস্যার সমাধান বল, ভাট বকিস না”।
বাপ্পা মাথা চুলকে বলল “আরে আমি তো সিরিয়াসলিই বলেছি। যাক গে, আলাদা রুম নিতে হবে, ও তো বলেছে ওর কাছে টাকা আছে। আমি কথা বলব?”
ঋজু বলল “বল। আর আই কার্ডটা চেয়ে নে। হোটেলে সবার আই কার্ড লাগবে”।
বাপ্পা গম্ভীর মুখ করে বাঁধনের সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে গেল। কয়েক মিনিট পরে এসে বলল “ওর কাছে হাজার দশেক আছে। এর বেশি লাগলে আমি দেব। আর এই নে আই কার্ড”।
বাঁধনের আই কার্ড ঋজুর দিকে এগিয়ে দিল বাপ্পা। ঋজু আই কার্ডটা না দেখে বুক পকেটে রেখে বাপ্পার দিকে তাকিয়ে বলল “ফাক”।
বাপ্পা অবাক হয়ে বলল “এখানে ফাক মারাচ্ছিস কেন? কী হল?”
ঋজু বলল “ছেলেটা বলছিল ওর কাছে টাকা নেই। কী করবে ঠিক নেই, এদিকে মেয়েটা দশ হাজার টাকা নিয়ে ঘুরছে। নিশ্চয়ই ছেলেটা জানত না। জানলে পালাত না”।
বাপ্পা বিরক্ত মুখে বলল “বার বার ছেলেটার কথা বলবি না ঋজু। দ্যাট বয় ইজ আউট, আই অ্যাম ইন”।
ঋজু বলল “আগে ভাল করে জামা ইন করে পরতে শেখ। আচ্ছা শোন, বাজেট হোটেলই দেখছি আর এরকম আলাদা ঘর নিলে দশহাজারটাকায় কুলোবে না। কী করবি?”
বাপ্পা বলল “সিকিউরিটির ব্যাপার আছে তো একটা। এছাড়া তো কোন উপায়ও নেই! আমরাও খানিকটা চাঁদা তুলতে পারি মেয়েটার জন্য”।
ঋজু চোখ ছোট ছোট করল “তোর না হয় ইন্টারেস্ট আছে, আমি তন্ময় আর শুভায়ু কেন টাকা দেব?”
বাপ্পা কাঁচুমাচু মুখে ঋজুর দিকে তাকিয়ে বলল “একজন অসহায় নারীর কথা ভেবে, তোদের একদিন শিওর হবে বৌদির কথা ভেবে দিবি”।
ঋজু বলল “তোর বাবাকে ফোন করে খবরটা দেব নাকি?”
বাপ্পা একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল “সবার বাবা কি তোর বাবার মত হয় রে? কত ভাল তোর বাবা, এক্কেবারে ডিডিএলজের অনুপম খেরের মত। মুখ দেখলেই মনে হয় যেন বলবে যাও শোনা, এই টাকা দিচ্ছি, একটু কে এফ সি থেকে গ্রিলড চিকেন খেয়ে এসো। আর শোন, ফেরার পথে যদি কোন মামণি পাও, তাহলে ইকো পার্ক থেকেও ঘুরিয়ে নিয়ে এসো। আর আছে আমার বাপ, সব সময় অমরীশ পুরীর মত চোখ মুখ বাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দশটাকা দিতে বললে এমন ভাব করে যেন একটা কিডনি উপড়ে নিয়ে রামছাগলকে ফিট করে দেব। তবু, কী করা, বাঁধনেরই দায়িত্ব, বাবাকে ঠিক বুঝিয়ে সুঝিয়ে নেবে, কী বলিস?”
ঋজু বলল “সে তো বটেই, পোলাও যখন স্বপ্নে খাবিই, তাহলে বেশি করেই ঘি মিশিয়ে যা। যতসব”।
রাস্তা খুলে দিয়েছে। পার্কিং প্লেস থেকে সব গাড়ি বেরনো শুরু হয়েছে।
তারা তড়িঘড়ি গাড়িতে গিয়ে বসল।
ঋজুর কী মনে হতে বাঁধনের আই কার্ডের দিকে চোখ পড়ল।
বাঁধনের নামটা দেখে তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল।
ঋজু বাপ্পাকে আই কার্ডটা দেখিয়ে আঙুল দিয়ে বাঁধনের নামের জায়গাটা দেখাল।
বাপ্পা সেকেন্ড দশেক থম মেরে বসে থেকে বাঁধনকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল “এই তুমি বিরিয়ানি রাঁধতে পারো?”

১৪

মালিনী রুমে ঢুকেই বললেন “বেডশিট আর কম্বলগুলো চেঞ্জ করে দিতে বোল”।

সৌরেন বিরক্ত হলেন। মালিনীর প্রবল শুচিবাই। বললেন “এসব হোটেলে তোমাকে খারাপ বেডশিট দেবে কেন?”
মালিনী বললেন “ওসব জানি না। বল”।
সৌরেন রুম সার্ভিসে ফোন করে বেডশিট চেঞ্জ করতে বললেন।
চান্দ্রেয়ী বাথরুমে ঢুকেছে। ঋজুকে তাদের হোটেলের নাম বলে দেওয়া হয়েছে। কাছাকাছিই কোন একটা হোটেলে রুম নিয়ে নেবে ওরা। শেষ রাতে ট্রেন থেকে নামতে হয়েছে বলে ঘুম পাচ্ছিল চান্দ্রেয়ীর। গাড়িতে ঘুমোতে পারে না সে। অভ্যেস নেই। আরেকটা ভাল ব্যাপার আছে তার। পাহাড়ী রাস্তায় বমি পায় না। অনেকেই আছে যারা পাহাড়ে উঠলেই বমি করতে শুরু করে। চান্দ্রেয়ীর সেসব নেই।
সাড়ে দশটা বাজে। কলের জল বেশ ঠান্ডা। গীজার চালিয়ে জল মিশিয়ে নিতে হচ্ছে। যদি খুব বেশি শীত নেই। পনেরো ষোল ডিগ্রি টেম্পারেচার। তাপমাত্রা আরামদায়ক। রোদ সরাসরি গায়ে লাগলে গরম লাগছে, হোটেলের ভেতরটা আবার বেশ ঠান্ডা।
বাথরুম থেকে বেরিয়ে চান্দ্রেয়ী খাটে শুয়ে পড়ল। তাদের ঘরে একটা ডাবল বেড আর একটা সিঙ্গল বেড রাখা। মালিনী রেগে গেলেন, “বেডশিট চেঞ্জ করে নি এখনও আর তুই শুয়ে পড়লি?”
চান্দ্রেয়ী বলল “ঠিকই তো আছে। সমস্যা কোথায়?”
মালিনী বললেন “তুই নাম আগে। ওরা চেঞ্জ করে দিয়ে যাক। তুই যা ঐ চেয়ারে গিয়ে বস। এই তুমি রিসেপশনে গিয়ে বল তো”।
সৌরেন বেরোলেন। মালিনীর সঙ্গে এলে এগুলো হবেই। হোটেলটার মজার ব্যাপার হল রিসেপশন গ্রাউন্ড ফ্লোরে আর রুমগুলো নেগেটিভ ফ্লোরে। খাদ ঘেঁষে তৈরী করা হোটেলগুলো এরকমই। লিফটে ফ্লোর সিলেক্ট করার সময় গুলিয়ে যায়। মাইনাস থ্রিতে তাদের ফ্লোর। যেতে হবে জিরোতে। খানিকটা চিন্তা করে জিরো সিলেক্ট করে দাঁড়ালেন। রিসেপশনে যে ছেলেটা ছিল তাকে রিকোয়েস্ট করে রিসেপশনেই বসলেন। লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে যেতে হবে। একদল লোক এসেছে কন্ডাকটেড ট্যুরে। রিসেপশনটা মাছের বাজার হয়ে গেছে। সৌরেন বিরক্ত হলেন। আগে জানলে এই হোটেলে উঠতেন না। ছুটির মধ্যে যদি সেই কলকাতার মাছের বাজারে গিয়ে পড়তে হয় তাহলে আর লাভ কী হল!
এর মধ্যেই একদল পাবলিক কন্ডাকটেড ট্যুর ম্যানেজারের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে। একটু মন দিয়ে শুনে বুঝলেন ট্যুর ম্যানেজারকে বলা হচ্ছে একজনের ঘরে এসি আছে বাকিদের ঘরে নেই কেন। ট্যুর ম্যানেজার কিছুতেই বুঝিয়ে উঠে পারছে না এই শীতে এসি কোনো কাজে লাগবে না। বাকিদের দাবী না লাগলেও এসি লাগবেই। কোন ছাড় নেই। ম্যানেজার ঘামছে। বোঝা যাচ্ছে প্রথম প্রথম টিম নিয়ে বেরিয়েছে।
সৌরেনের ফোন বাজছিল। দেখলেন তনয়া ফোন করছে। ধরলেন না। ইচ্ছা করছিল না।
মালিনীর সঙ্গে শরীরহীন সম্পর্ক থেকে বেরোতে তনয়ার সঙ্গে এগিয়েছিলেন কিন্তু ইদানীং সবটাই বিরক্ত করছে।
দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। একেকটা সময় মনে হয় শারীরিক চাহিদার জন্য তনয়ার কাছে না গেলেই হয়ত ভাল হত। প্রথম প্রথম বুঝতে পারেন নি। মালিনীর হঠাৎ করে ইউটেরাস বাদ যাওয়া, হঠাৎ হঠাৎ হওয়া মুড স্যুইং, অহেতুক শুচিবাই সব কিছু ধীরে ধীরে শারীরিকভাবে দূরে করেছে তাকে মালিনীর থেকে। মানসিকভাবে অবশ্য স্বাভাবিক দাম্পত্যই কাটিয়ে গিয়েছেন। মেয়েটা বড় হয়েছে সময়ের নিয়মেই। সেভাবে আলাদা করে কখনোই নজর করতে পারেন নি।
তনয়ার কথাটা শুনে প্রথমে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল তার। চণ্ডীগড়ে নেমে ঠিকই করেছিলেন উল্টোপালটা ভাবে ঘুরবেন, পরে ঠিক করলেন কাছে থেকেই দেখতে হবে ছেলেটা ঠিক কী করে। এমন প্রেম যে কোলকাতা থেকে মেয়ের পেছন পেছন ঘুরতে হবে? প্রেমের লেভেলটা ভাবতে ঠোঁটের কোণে একটু হাসি

এসেই মিলিয়ে গেল। হাসলে হবে না। ছেলের ঠিকুজি কুষ্ঠী না জেনে কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছিলেন না। একটা ভুল বাড়িতে বিয়ে, একটা বাজে ছেলেতে বিয়ে, সব কিছু নষ্ট করে দিতে পারে।
রিসেপশন খানিকটা ঠান্ডা হয়েছে। কন্ডাকটেড ট্যুরের ম্যানেজার সম্ভবত বুঝিয়ে সুঝিয়ে বা এসি ঘর দিয়েই হয়ত ঠান্ডা করেছে। একটা গোটা দিন ট্রেনে ছিলেন। সৌরেনের ঘুম পাচ্ছিল। লাঞ্চের কথা বলে ঘরে পৌঁছলেন।
রুম সার্ভিসের ছেলেটা এসেছে। মালিনী গম্ভীর মুখে তদারকি করছে। চান্দ্রেয়ী নেই।
সৌরেন হতভম্ব গলায় বললেন "মামণ কোথায়?"
মালিনী বললেন "ব্যালকনিতে গেছে। কোন বন্ধু ফোন করেছে"।
সৌরেন গম্ভীর হয়ে গেলেন।

১৫
-ভাই।
-বল।
-ধর্ম আলাদা হলে কী সমস্যা হয়?
-আমি কী করে জানি? যাদের ধর্ম আলাদা তারা বলতে পারবে।
-একটা কথা বলব ভাই, কিছু মনে করবি না তো?
-বল।
-একটা অস্বস্তি হচ্ছে নামটা জানার পরে।
-কী?
-মেয়েটা টেরোরিস্ট না তো? দেখা গেল বাস ওড়াতে এসেছে।
-ওহ, নামটা দেখেই হাওয়া ফুস হয়ে গেল তাই না? এবার? তখন তো খুব বিপ্লব করছিলি।
-কী করে দেখব? দেখতে তো বাঙালিদের মতই তো লাগে। আমি তো ভেবেছিলাম বোরখা থাকবে, ট্রেনে বার চারেক নামাজ পড়বে, কই কিছুই তো সেরকম করল না। আমি কী করে বুঝব?
-দেখ বাপ্পা, যখন তোকে বোঝাতে গেছিলাম, তখন বুঝিস নি। ট্রেনের আলাপের লোককে কখনও ঘরে নিয়ে আসতে নেই। আর এদের পুরো ব্যাপারটাই ফিসি। ছেলেটা ছেড়ে পালিয়েছে, ছেলেটা হিন্দু না মুসলমান সেটাও তো জানি না। এখন সব মিলিয়ে একটা বিতিকিচ্ছিরি সিচুয়েশন তৈরী হচ্ছে ধীরে ধীরে।
বাপ্পা চুপ করে বসল। তারা হোটেলের ছাদে এসে দাঁড়িয়েছে। হালকা রোদ আছে। শুভায়ু শুয়ে আছে, তন্ময় স্নান করছে। ঠিক আছে বিকেল নাগাদ সবাই ম্যালে রওনা হবে।
একটু ভেবে বাপ্পা বলল "আমার মনে হয় আমাদের মেয়েটার সঙ্গে এবার সব ক্লিয়ার কথা বলে নেওয়া উচিত। অনেক হয়েছে, গোটা ব্যাপারটার ট্রান্সপারেন্সি দরকার। যাবি এখন?"
ঋজু বলল "কোথায়?"
বাপ্পা বলল "মেয়েটার ঘরে। কথা বলি"।
ঋজু কাঁধ ঝাঁকাল "ওকে, চল"।
দুজনে খানিকটা ইতস্তত করল। মিনিট পাঁচেক বাদে বাঁধনের রুমের কলিং বেলে হাত দিল।
বাঁধন দরজা খুলে তাদের দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। ঋজু বলল "একটু কথা ছিল তোমার সঙ্গে"।
বাঁধন দরজা ছেড়ে দাঁড়াল। দুজনে ঢুকে সোফায় বসল। বাঁধন খাটে বসল।
বাপ্পা ঋজুকে বলল "কী রে বল"।
ঋজু একটু থমকাল। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল "দেখো বাঁধন, পথের সমস্যার জন্যেই বল আর যার জন্যেই বল, তোমার আমাদের সঙ্গে যাওয়াটাই মনে হয় সেফ"।

বাঁধন কিছু বলল, চুপ করে রইল।
ঋজু বলল "এবার স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব তৈরী হওয়া দরকার, তার জন্য যে জিনিসটা দরকার তা হল ট্রান্সপারেন্সি। আমরা একটু বরং নিজেদের মধ্যে পরিচয় করে নি। আমার নাম ঋজু সান্যাল, ওর নাম তপোব্রত মুখার্জি, ডাকনাম বাপ্পা, বাকি দুজন তন্ময় রায় এবং শুভায়ু সরকার। আমি সবে পাস আউট করেছি, ক্যাম্পাসিংএ চাকরিও পেয়েছি কিন্তু কবে জয়েন করতে হবে বলে নি এখনও। বাপ্পা বাবার দোকান দেখে। টাকা জমিয়ে এক প্রকার আমার জোরাজুরিতে বেড়াতে এসেছে। এখানে আমার প্রেমিকা বেড়াতে এসেছে বলে আমার মাথায় পোকা উড়ে গেল আর ব্যাস, আমি চলে এলাম। তন্ময় আর শুভায়ু দুজনেরই বাবার ব্যবসা আছে। এবার তোমার কথা শুনি। তোমার নাম বাঁধন ইসলাম তোমার আই কার্ড দেখে জানতে পেরেছি। তোমার ঐ ফাঁকিবাজ ছোকরাটিও কি তোমার ধর্মের ছিল না অন্য কোন ধর্মের?"
বাঁধন হাসল সামান্য, বলল "জানতাম, এত সব কিছুর মধ্যে জাত ধর্ম সংক্রান্ত প্রশ্নই সবাই করে বেড়াবে। আমিই সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চোখ বুঝে ওর কথায় চলে এসেছি। আর তোমার ঐ ফাঁকিবাজ ছেলেটি কোন ধর্মের নয়। ও নাস্তিক। মারাত্মক রকমের নাস্তিক। জন্মসূত্রে হিন্দু। শোন, তোমাদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই, আমার ব্যাগে আর ডি এক্স নেই। চাইলে চেক করে নিতে পারো"।
ঋজু লজ্জিত হয়ে বলল "সেভাবে বলি নি আসলে। বুঝতেই পারছ কিছু সিকিউরিটি মেজার তো নিতেই হয় বিদেশ বিভুইয়ে"।
বাঁধন বলল "তা বটে। আমি কেন এত কষ্ট করেও পাহাড়ে এসেছি জানো? কারণ আমি জানি সব কিছুর শেষে আমাকে সেই ফিরে যেতেই হবে। বাবার পছন্দ করা কোন ছেলের স্কুটারের পেছনে বোরখা পরে ঘুরে বেড়াতে হবে। আমি জানি, এটাই ভবিতব্য। কিন্তু যাওয়ার আগে পাহাড় দেখে যেতে চেয়েছি আমি। কী আশ্চর্য না, পাহাড় থাকবে, এত সুন্দর জায়গাটা থাকবে আর আমিই থাকব না?"
বাপ্পা উশখুশ করছিল। হঠাৎ উত্তেজিত গলায় বলে বসল "তোমাকে কিন্তু একদম বাঙালির মতই দেখতে লাগে"।
বাঁধন হেসে ফেলল "স্বাভাবিক। আমি তো বাঙালিই। তুমি কি আশা করেছিলে আমি ভিনগ্রহের প্রানীদের মত দেখতে হব? নাকি ব্যাগে টাইম বোম্ব নিয়ে ঘুরে বেড়াবো"?
বাপ্পা বিষম খেতে শুরু করল।

১৬

"হ্যাঁগো, কালিবাড়ীটা কি পুরোটাই অবাঙালিদের দখলে চলে গেল?"
মালিনী ফিসফিস করে বললেন সৌরেনকে।
তারা সিমলা কালিবাড়ীতে প্রতিমা দর্শন সেরে একটা বেঞ্চিতে বসেছিলেন।
একদল ভদ্রমহিলা মন্দিরের ভেতরে জয় মাতাদির সুরে গান গাইছেন। আশা করেছিলেন শ্যামা সঙ্গীত হবে হয়ত। মালিনীকে বললেন "বাঙালির সব কিছুই এখন দখল হয়ে যাচ্ছে, ধরে নাও এখানে কালী মাও হয়ে গেছেন। তাছাড়া এখানে শ্যামা সঙ্গীত করবেই বা কে?"
মালিনী বললেন "তা বলে এভাবে দখল হয়ে যাবে মা?"
সৌরেন বললেন "দখল কিছুই হয় না বুঝলে। সবই থাকে। আমরাই বরং এই দখল টখল নিয়ে বেশি চিন্তা ভাবনা করি। হয়ত এখন দেখছ অবাঙালিরা গাইছে, পরে হয়ত শ্যামাসঙ্গীতও হবে"।
মালিনী উশখুশ করে উঠলেন "মামণ কোথায় গেল?"
সৌরেন বললেন "ঐ তো। ফটো তুলছে"।
মালিনী দেখলেন চান্দ্রেয়ী মন্দিরের অন্য কোণায় দাঁড়িয়ে ফটো তুলছে। মন্দির চত্বরে ভালই ভিড়। কম বয়সী

ছেলে মেয়েও আছে।
সৌরেন বুঝতে পারছিলেন না এদের ভিড়ে সেই ছেলেটা আছে নাকি। তীক্ষ্ণ চোখে চান্দ্রেয়ীর চালচলন লক্ষ্য করছিলেন তিনি। মোবাইলেই চোখ মেয়ের।
বুঝতে পারছিলেন না কীভাবে ব্যাপারটা সামলাবেন। ছেলেটা সম্পর্কে চান্দ্রেয়ীকেই জিজ্ঞেস করবেন? নাকি তনয়াকে ফোন করে জানবেন আবার। তনয়াকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছিল না তার। ইদানীং তনয়ার সঙ্গে কথা বলতেও অস্বস্তি লাগে। বিঁধিয়ে কথা বলা অভ্যাস তনয়ার। শরীর শীতল হবার পর এই ধরণের কথা শুনতে ভাল লাগে না।
মালিনী বললেন "এখান থেকে কি ম্যালে যাবে?"
সৌরেন বললেন "তুমি তো আর হাঁটতে পারবে না মনে হচ্ছে, প্যারামবুলেটর নেব নাকি?"
মালিনী রাগলেন "ধুস! ও একটু একটু করে যেমন হাঁটছি ওতে যতটা যাওয়া যায় দেখছি। ও সব প্যারামবুলেটর আমাকে নিতে পারবে না। ভেঙে যাবে"।
সৌরেন বললেন "তাতে আমাদের কী? ভাংলে ভাঙবে!"
মালিনী বললেন "কোন দরকার নেই। ভাঙলে তো আমারও লাগবে"।
সৌরেন আর কিছু বললেন না। কালিবাড়ী থেকে সিমলা শহরটা সুন্দর দেখা যায়। পাহাড়ের গায়ে বেড়ে ওঠা হিল স্টেশন। হিমাচল প্রদেশের রাজধানী। যত দিন যাচ্ছে, ঘিঞ্জি থেকে ঘিঞ্জিতর হয়ে যাচ্ছে। বছর পনেরো আগে এসেছিলেন। তখনকার সিমলার সঙ্গে এখনকার সিমলার অনেক তফাৎ। আধুনিক পৃথিবীর ছোঁয়া লেগেছে পাহাড়ে। প্রতিদিন হোটেল গজিয়ে উঠছে পাহাড়ের আনাচে কানাচে। দেশের জনসংখ্যা যেভাবে বেড়েছে সেভাবেই বেড়েছে বিভিন্ন শহরে পর্যটকের সংখ্যা। নতুন নতুন হোটেল হবে কালের নিয়মেই। প্রকৃতি কতটা নিতে পারবে প্রশ্নটা সেখানেই। বছর কয়েক আগে উত্তরাখন্ডের ভয়াবহ বন্যার কথা মনে পড়ল সৌরেনের। সে বছর ঐ সময়েই কেদার বদ্রী যাবার কথা ছিল তাদের। শেষ মুহূর্তে প্ল্যান ক্যান্সেল হয়ে যায়।
ঋজু, বাপ্পারা মন্দির চত্বরেই আছে। একটু দূরে, একটা বেঞ্চে ঋজু, তন্ময়, বাপ্পা আর শুভায়ু বসে আছে। বাঁধন হোটেলেই থেকে গেছে। টায়ার্ড লাগছে তার। চান্দ্রেয়ীর মেসেজ পাবার সাথে সাথেই ঋজু মন্দিরে চলে এসেছে। বসে ছিল কিছুক্ষণ নিজেরা। গল্প করছিল। চান্দ্রেয়ীরা আসতে নড়ে চড়ে বসেছে।
চান্দ্রেয়ীর দিকে ঋজু কখনই সরাসরি তাকায় নি। চান্দ্রেয়ী বলে দিয়েছে তার বাবা তার দিকে সব সময় নজর রাখছে। কথা বলা অসম্ভব। ঋজুর অসহ্য লাগছিল। তার ইচ্ছা করছে যে কোন মুহূর্তে চান্দ্রেয়ীর হাত ধরে কোথাও একটা হারিয়ে যেতে।
বাপ্পা ঋজুর কানে কানে বলল "ভাই তোর শাশুড়ি তো জয়ললিতার থেকেও মোটা। সামলাতে পারবি তো?"
ঋজু কটমট করে বাপ্পার দিকে তাকাল। শুভায়ু বলল "শ্বশুর মশাইয়ের মাসল দেখেছিস? ধরতে পারলে স্রেফ কাটাপ্পার মত কুচি কুচি করে কেটে রেখে দেবে"।
তন্ময় খিক খিক করে হাসতে হাসতে বলল "আচ্ছা ভাই, আমরা এখানে সিরিয়াসলি এই ছিড়তে এসেছি? ঋজুর ছামিয়া ঘুরে বেড়াবে আর আমরা কি মাগনার খুফিয়া সিকিউরিটি গার্ড? আমরা আমাদের মত ঘুরব না?"
ঋজু বলল "ঘোর না, কে বারণ করেছে তোদের? আমি কি তোদের হাতে পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি?"
বাপ্পা গম্ভীর হয়ে বলল "বাঁধনকে আনা উচিত ছিল। একা একা মেয়েটা কষ্ট পাচ্ছে"।
তন্ময় বলল "শোন ভাই, মন্দির বলে বেঁচে গেলি, গালাগাল দিচ্ছি না। বলছি এভাবে মেয়ে দেখলেই ছুকছুকানি বাড়ানোটা বন্ধ কর। তাছাড়া আজকালকার মার্কেটে অন্য ধর্মের মেয়ে বিয়ে করার কথা ভাবিসও না। চুপচাপ ঘোর। বাড়ি যা, হালকা মুতে ঘুমিয়ে পড়। ও হ্যাঁ, তার আগে কাজ টাজ খোঁজার কথাও ভাব"।
বাপ্পা রেগে গেল "কেন অন্য ধর্মের মেয়ে বিয়ে করা যাবে না কোন ধর্মগ্রন্থে বলেছে শুনি? আর যদি তা নাও

যায়, দরকার হলে আমি নিজেই ধর্মান্তরিত হয়ে যাব"।
শুভায়ু হাসতে শুরু করল। তন্ময় বলল "কী হল হাসছিস কেন?"
শুভায়ু হাসতে হাসতে তন্ময়ের কানে কিছু একটা বলল। তাতে তন্ময়ও হাসতে লাগল। বাপ্পা বলল "কী রে, কানে কানে কী বলছিস, যা বলছিস সামনা সামনি বল"।
তন্ময় বলল "ভাই একটা কথা বলব কিছু মনে করবি না তো?"
বাপ্পা বলল "কী?"
তন্ময় বলল "চ, মন্দিরের বাইরে চ, বলছি"।
বাপ্পা বলল "পারলাম না। পরে বলিস"।
তন্ময় বলল "চ না। আমি বলছি তো"।
দুজনে মিলে মন্দির চত্বর থেকে বেরোল। বাপ্পা বলল "বল কী বলছিলি?"
তন্ময় হাসতে শুরু করল। বাপ্পা বিরক্ত হয়ে বলল "তুই হাসতে থাক, আমি যাই"।
তন্ময় বাপ্পার হাত ধরে বলল "বলছি কী ভাই, তুই বলছিস ধর্মান্তরিত হবি, বলছি সবটাই হবি তো? শারীরিক ভাবেও?"
বলে তন্ময় বাপ্পার কানে কানে কিছু একটা বলল। বাপ্পা রেগে মেগে বলল "খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। শুধু ইয়ার্কি মেরে যাবে"।
তন্ময় খিক খিক করে হাসতে থাকল।

১৭

ঋজুরা ম্যালে ঘুরছিল। ছ'টা বাজে। অন্ধকার হয় নি যদিও।
তন্ময়ের মোবাইলটা দামী। কায়দা করে ফটো তুলছে। একটা বেঞ্চিতে বসে ঋজু লোকজন দেখছে।
চান্দ্রেয়ীরা হোটেলে ফিরে গেছে। মালিনী হাঁটতে পারছিলেন না।
ঋজু দেখল চান্দ্রেয়ী ফোন করছে, ধরল "বল"।
চান্দ্রেয়ী ধরা গলায় বলল "কোথায়?"
ঋজু বলল "ম্যালে। তোমার বাবা কোথায়?"
চান্দ্রেয়ী বলল "গেছে কোথাও একটা। আর কী করব। বাবা সব জেনে গেছে। খুব সাবধান কিন্তু"।
ঋজু বিরক্ত গলায় বলল "এক কথা বার বার বলার কোন দরকার নেই। একবার বললেই তো হয়"!
চান্দ্রেয়ী বলল "টেনশন আমার হচ্ছে। তোমার আর কী! বন্ধুদের সঙ্গে ফুর্তি করবে!"
বাপ্পা ইচ্ছা করে ঋজুর ফোনের কাছ থেকে চ্যাচাল "উফ, ঐ দেখ কী সুন্দরী ভাই। দেখ দেখ দেখ"।
ঋজু কটমট করে বাপ্পার দিকে তাকাল।
চান্দ্রেয়ী শ্লেষাত্মক গলায় বলল "বাহ বাহ, ভালই তাহলে। রথ দেখা কলা বেচা সবই হচ্ছে?"
ঋজু বলল "কিছুই হচ্ছে না। বাপ্পা তোমাকে খ্যাপাচ্ছে"।
চান্দ্রেয়ী রেগে বলল "ফালতু ছেলে তো। চেনে না জানে না আমায়, খ্যাপাতে চলে এল? কোথাকার সড়কছাপ ছেলেদের সঙ্গে মেশো তুমি"!
ঋজু বলল "ওহ তুমি হোটেলে বোর হচ্ছ বুঝতে পারছি। পরে ফোন কোর"।
চান্দ্রেয়ী বলল "সে তো বলবেই, ওখানে ম্যালে বসে মামণি ছকাতে অসুবিধে হচ্ছে তো! দেখো দেখো ভাল করে দেখো!"
ফোনটা কেটে দিল চান্দ্রেয়ী। ঋজু বলল "যাহ্ শালা। রেগে গেল"।
বাপ্পা বলল "খচে গেল বউদি? একটা কিসি পাঠিয়ে দে মেসেঞ্জারে, খুশি হয়ে যাবে"।
ঋজু তন্ময়ের দিকে তাকাল, আঙুলটা বাপ্পার দিকে রেখে "এই বালটাকে খাদে ফেলে দিতে পারবি? যা

টাকা লাগে আমি দেব"।
তন্ময় বলল "বেড়ালের প্রাণ তো। খাদে ফেলবি দেখবি ঠিক গাড়িতে উঠে কোন একটা মামণিকে ঝাড়ি মারতে শুরু করে দেবে। এসব মাল একশো বছরে একটা জন্মায়। আগে জন্মালে বাপ্পার নামে মন্দির টন্দির বসত"।
শুভায়ু বলল "ভবিষ্যতে বসতেই পারে কোন ভরসা নেই"।
তাদের সামনের বেঞ্চিতে এক জোড়া নব দম্পতি বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবে বসেছে। একজন আরেকজনকে আইসক্রিম খাইয়ে দিচ্ছে। খুনসুটি চলছে। বাপ্পা উদাস গলায় বলল "আমিও হানিমুন করতে এসে আইসক্রিম খাইয়ে দেব বউকে"।
তন্ময় ফুট কাটল "দেখিস বেশি কামড় দিলে আইসক্রিম ছোট হয়ে গেলে বিপদ। তোর তো আবার লিলি আইসক্রিম। একটু গরমেই গলে যায়"।
বাপ্পা তেড়ে উঠল "কেন তুই টেস্ট করে দেখেছিস বুঝি?"
তন্ময় ক্যামেরা নিয়ে দূরে চলে গেল। বাপ্পা ঋজুকে বলল "মেয়েটার জন্য কিছু খাবার নিয়ে যেতে হবে"।
ঋজু বলল "নিয়ে যা। কে বারণ করেছে?"
বাপ্পা বলল "প্যাস্ট্রি নিয়ে যাব?"
ঋজু বলল "আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন? আমার এদিকে ফাটছে আর ঝাঁট জ্বালাতে শুরু করেছিস তুই"।
বাপ্পা বলল "ভেসলিন আছে, দেব?"
ঋজু বলল "যা না, এখানে ভাট না বকে একটা ঘোড়ার পিঠে উঠে ঘোর না। আলাউদ্দিন খিলজির মত লাগবে তোকে"।
বাপ্পা খুশি হয়ে বলল "মাইরি! বলছিস?"
ঋজু বলল "মাইরি। যা গিয়ে ঘোড়ায় ওঠ"।
বাপ্পা খুশি হয়ে এগিয়ে একটা ক্যামেরাম্যান ঠিক করে ঘোড়ায় উঠল একটা। দাঁত টাত বের করে ফটো তুলতে লাগল। তন্ময় খিক খিক করে হাসতে হাসতে বলল "গাধা ঘোড়ায় উঠেছে। দেখ ভাই"।
ঋজু হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই তার চোখে পড়ল চান্দ্রেয়ীর বাবা ম্যালে একটা বেঞ্চে বসে কাউকে একটা ফোন করছেন।
সে একটু তটস্থ হল। চান্দ্রেয়ী বলেছে বাবা সব জেনে গেছে, ভদ্রলোক তাকে চেনেন না কি, তা জানা নেই। সিমলা ম্যাল বেশ সাজানো গোছানো। অনেকটা জায়গা নিয়ে। ম্যালের এক কোণায় ভারতীয় পতাকা। প্রচুর মানুষ ঘুরছে, কেউ সেলফি তুলছে, কেউ হানিমুনে এসেছে। কন্ডাক্টেড ট্যুরের লোকজনদেরও দেখা যাচ্ছে। তাদের কাছেই চারজন ভদ্রমহিলা দুপুরের ডালে রাধুনি পিসির চুল পড়েছিল কি না তা নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা করছেন। একজন এর মধ্যে খান পাঁচেক মাফলার পরে বসে আছেন, যদিও অতগুলো মাফলার পরার মত শীত একেবারেই নেই। মাঝে মাঝে শীতল একটা হাওয়া দিচ্ছে এই যা। ম্যালের এক পাশে জায়ান্ট স্ক্রিণে খবর দেখানো হচ্ছে। বেশ উৎসবমুখর চারদিক। বসে থাকলেই মন ভাল হয়ে যাচ্ছে।
সে চান্দ্রেয়ীকে একটা মিসড কল মারল। মিসড কলটা তাদের কোড। মিসড কল পেলে চান্দ্রেয়ী সরে গিয়ে তাকে ফোন করে অথবা জানিয়ে দেয় ব্যস্ত আছে কথা পরে বলবে।
চান্দ্রেয়ী সঙ্গে সঙ্গেই ফোন করল। মুড অফ বোঝাই যাচ্ছে। বলল "বল কী বলবে? মেয়ে টেয়ে দেখা হল?"
ঋজু বলল "তোমার বাবা একজনের সঙ্গে বেশ অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছেন। ম্যালেই আছেন"।
চান্দ্রেয়ী বলল "নির্ঘাত গোয়েন্দা লাগিয়েছে তোমার পেছনে"।
ঋজু বলল "ভাল তো। গোয়েন্দা তোমার বাবাকে জানিয়ে দেবে আমি কত ভাল ছেলে"।
চান্দ্রেয়ী বলল "কী ভাল ছেলে তা তো জানাই আছে,এই শোন, নিশ্চয়ই আজ মদ খাবে। তাই না?"
ঋজু বলল "নানা, একদম না"।

চান্দ্রেয়ী বলল "আমার দিব্যি থাকল। মদ খেলে আমার মরা মুখ দেখবে, বলে দিলাম"।
ঋজু বলল "উফ, সব কথায় তো এত দিব্যি দেবার কিছু হয় নি! এই ঠান্ডায় একটু চলতেই পারে। তা বলে কি ড্রেনে পড়ে থাকব"?
চান্দ্রেয়ী বলল "না তুমি মদ খাবে না। আমি বলেছি না মানে না। এই শোন আমি রাখছি, মা আসছে এদিকেই"।
ফোনটা কেটে গেল।
ঋজু ব্যাজার মুখে ফোনটা পকেটে রাখল। তন্ময় বলল "আজ জশন হবে ভাই, এই শীতে, আমি তুমি আর সিগনেচার। জমে যাবে মামা!"
ঋজু বলল "আমি খাব না, তোরা খা"।
তন্ময় রেগে বলল "নিশ্চয়ই প্রমিস চুদিয়েছ না?"
ঋজু ধীরে ধীরে মাথা নাড়াল।
তন্ময় বলল "খাস না। আমরা খাব, তুই দেখবি,তারপর নাড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়বি"।
ঋজু গম্ভীর হয়ে বসে রইল।

১৮
পরিবার, মানুষজন থেকেও কেউ কেউ একা হয়ে যায়। মানুষ আসলে মৃত্যুর দিকে যতটা এগোতে থাকে, ততটাই একা হয়ে যেতে থাকে।
হোটেল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সৌরেনের মুখ অজানা কারণেই তেতো হয়ে যাচ্ছিল। তনয়ার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার কথা ভাবাটাই কি ঐতিহাসিক ভুল ছিল? রাতের পর রাত বিছানায় মালিনীর প্রত্যাখ্যান ভেতরে ভেতরে জেদি করে তুলেছিল প্রতিটা দিন।
তনয়ার সঙ্গে দেখার দিনটাও তো ভোলার নয়। অফিস ফেরতা প্রবল বৃষ্টির মধ্যে এক বাড়ির বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ানো। দরজা খুলে সদ্য যুবতী মেয়েটা ঘরের ভেতর ঢুকতে বললেন। কথায় কথায় জানা গেল স্বামী পরিত্যক্তা তনয়া কোনভাবে খড়কুটো আঁকড়ে বেঁচে আছেন। প্রতিটা মুহূর্তে সৌরেন ভেবেছেন এমন যুবতী কোন মেয়েকে পরিত্যাগ করতে পারে মানুষ? তনয়া জানিয়েছিলেন তার বর একজনকে ছোটবেলা থেকেই ভালবাসত। বাবা তাদের জোর করে বিয়ে দিয়েছিলেন। একটা সময় ছেলেটার বাবা মারা যেতেই তনয়ার বর তনয়াকে একটা চিঠি লিখে চলে যায়। কোথায় গেছে তনয়া সেটাও জানেন না। ছেলে যদিও বউ পরিত্যাগ করে গেছে, কাজের কাজটি ঠিকই করে গেছিল। তনয়ার ছেলে রাহুলের তখন এক বছর বয়স। ছেলেকে মানুষ করার জন্য তনয়ার সম্বল ছিল কলকাতার বাড়িটা আর ফিক্সড ডিপোজিটের সুদ।
তখন চান্দ্রেয়ী ফাইভে পড়ে। মালিনীর সঙ্গে একঘেয়ে দাম্পত্য পানসে হতে শুরু করেছে সৌরেনের। শুরু হল প্রতিদিন অফিস ফেরতা তনয়ার বাড়ি যাওয়া। শরীর নিয়মমাফিক মিলিত হল শরীরের সঙ্গে। যেটা মালিনীর পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না, তনয়া সে শূন্য স্থান পূরণ করলেন। মাইনের একটা ভাল অংশ তনয়ার অ্যাকাউন্টে জমা হতে শুরু করল। মালিনীর প্রতি অবশ্য কর্তব্য করে গেছেন বরাবর।
অন্যদিকে তনয়ার সব কিছু অনুমোদনযোগ্য নয় সেটা পরে বুঝেছেন সৌরেন। এটাও বুঝেছেন তিনি একাই নন। অন্য পুরুষেরও আসা যাওয়া আছে তনয়ার কাছে। খানিকটা জীবিকার প্রয়োজনেই। সৌরেন প্রথমে অভিমানী হয়েছিলেন। কয়েক দিন পরে নিজেই বুঝেছিলেন, জীবনের একটা সময়ে মানসিক সম্পর্কের থেকেও বেশি জরুরি রিপু দমন। ধীরে ধীরে ফিরে গেছেন তনয়ার কাছে। এটা সেটা সোনা দানা দিয়েছেন, সযত্নে মালিনীকে লুকিয়ে সম্পর্ক লালন করে গেছেন।
মালিনীর অবশ্য কোন কালেই সন্দেহ বাতিক ছিল না। তার নিজেকে এবং মেয়েকে সামলাতেই সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। বর কী করছে না করছে সেভাবে কখনোই নাক গলাতে যান নি তিনি। হয়ত

নিজেও ভেবেছেন যে শারীরিক অপূর্ণতা তার জন্য সৌরেনের হয়েছে, তা যদি অন্য কোন জায়গা থেকে পূর্ণতা পায় তাতে কোন ক্ষতি নেই।
হোটেলের কাছেই ম্যাল। সৌরেনের প্রেশারের ওষুধ শেষ হয়ে গেছিল। একটা দোকান থেকে ওষুধ কিনে নিলেন। সিমলা ম্যাল অত্যন্ত সুদৃশ্য। ম্যাল অঞ্চলটার মিল আছে দার্জিলিঙের সঙ্গে। ব্রিটিশদের গ্রীষ্মকাল কাটানোর জায়গা আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েছে। পরিচ্ছন্নতা চোখে পড়ার মত। সৌরেন খানিকক্ষণ ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে হেঁটে ইন্ডিয়ান কফি হাউসে ঢুকলেন। কলকাতায় থাকতে শেষ কবে কফি হাউসে গিয়েছেন মনে করতে পারেন না। সিমলার হালকা শীতে ব্ল্যাক কফি মন্দ লাগল না। কয়েক মিনিটের জন্য ভুলে গেলেন মামণের কথা, ছেলেটার কথা, মালিনী-তনয়ার কথা। ভিড়, হই হুল্লোড়, কফি হাউজের আড্ডা সব মিলিয়ে চুপ করে বসে থাকতে খারাপ লাগছিল না।
কফি হাউস থেকে বিল দিয়ে বেরোচ্ছেন এমন সময় দেখলেন ফোনটা বেজে উঠছে। তনয়া। ধরবেন না ধরবেন না করেও ধরলেন "বল"।
"ভুলেই তো গেলে একেবারে বউ মেয়েকে পেয়ে"। ওপাশের গলায় ছদ্ম অভিমান। মনে মনে হাসলেন সৌরেন। তনয়ার মত মেয়েরা খুব ভাল অভিনয়ে ভুলিয়ে রাখতে পারে। অবশ্য সেটাই তো চেয়েছিলেন এককালে। এখন আর এর জন্য তনয়াকে দোষ দিচ্ছেন কেন!
সৌরেন বললেন "বল, আমি একাই ঘুরছি"।
তনয়া বললেন "ছেলেটার ব্যাপার জানতে চাও না?"
সৌরেন বললেন "তুমি কতটা জানো?"
তনয়া বললেন "অনেকটাই জানি"।
সৌরেন বললেন "জেনে কী লাভ তোমার? না জানলেই বা কী হত?"
তনয়া বললেন "বাহ, জানব না? তোমার মেয়ে তো আমারও মেয়ে তাই না?"
সৌরেন তেতো হাসলেন "তাই বুঝি? আমার মত আর ক'জনের ছেলে মেয়ে তোমার মেয়ে জানতে পারি কি?"
তনয়া রাগলেন না, হেসে বললেন "কারও না। তুমি বরাবর আমার কাছে স্পেশাল। তুমি বিশ্বাস কর আর না কর"।
সৌরেন বললেন "জেনে খুশি হলাম"।
তনয়া বললেন "কোথায় আছ এখন?"
সৌরেন বললেন "ম্যালে"।
তনয়া বললেন "আমারও খুব ইচ্ছা করছে জানো তোমার হাত ধরতে সিমলা ঘুরতে"।
সৌরেন অন্যমনস্ক ভাবে বললেন "হু"।
ম্যালের মূল জায়গায় চলে এসেছেন। চারদিকে সবাই খুব আনন্দ করছে। সৌরেন একটা বেঞ্চে গিয়ে বসলেন।
তনয়া বললেন "ছেলেটার ছবি সহ সব ডিটেলস তোমায় হোয়াটস অ্যাপ করছি। দেখে নাও"।
সৌরেন বললেন "লাগবে না। পাঠানোর দরকার নেই"।
তনয়া বললেন "তুমি শিওর?"
সৌরেন বললেন "হ্যাঁ। লাগবে না। আমি বেড়ানোটাকে নষ্ট করতে চাই না"।
তনয়া বললেন "আমাকে নিয়ে গেলেই আর নষ্ট করতে হত না। সেই তো তোমার বউ হোটেলেই আটকে আছে..."
সৌরেন বললেন "তোমার আজ ফাঁকা? কেউ আসবে না?"
তনয়া বললেন "রাতে। বিকেলে একমাত্র তোমারই ইচ্ছা করে সেটা জানো না?"

তনয়ার ইঙ্গিতটা বুঝলেন সৌরেন। বললেন “দিনের শেষে সবাই বাড়িতে ফিরতে চায় তনয়া”।
তনয়া হাসতে হাসতে বললেন “তা বটে। তবে বাড়ি ফেরার মত বাড়ি না হলে ফিরে কি সেই মজাটা পাওয়া যায়”?
সৌরেন উত্তর দিতে গিয়েও দিলেন না। সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না।

১৯

সন্ধ্যের পরে বৃষ্টি নামল হঠাৎ করে। ততক্ষণে তারা অবশ্য হোটেলে পৌঁছে গেছিল। সারাদিন খুব একটা শীত লাগছিল না। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ করে সন্ধ্যে নামল, সাথে শীতও। একটা হুইস্কির বোতল কেনা হয়েছে। রুমে ফিরে সেটাকে আলমারিতে সযত্নে তোলা হয়েছে।
সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা। ঋজু চান্দ্রেয়ীর সঙ্গে হোয়াটস অ্যাপে চ্যাট করছে। চান্দ্রেয়ীর বাবা বৃষ্টিতে ম্যালে আটকে আছেন বলে ফোন করে জানিয়েছেন। তবে চান্দ্রেয়ী ফোন করতে বারণ করছে কারণ ফোন করতে হলে তাকে রুমের বাইরে যেতে হচ্ছে যেটা এখন সম্ভব নয়। কম্বল জড়িয়ে চিকেন পকোড়া খাচ্ছে মা মেয়ে।
তন্ময় শুভায়ু আর বাপ্পা তিনজনে মিলে তাস খেলছে। বাপ্পা বলল “বাঁধনের ডিনারটা ঘরে দিতে বলে দিয়েছি”।
শুভায়ু তাসের দিকে তাকিয়ে বলল “পারলে তো তুই নিজেও হোম ডেলিভারি হয়ে যাস ঐ ঘরে”।
তন্ময় বলল “আমার কিন্তু মনে হয় আমরা একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলছি। বাপ্পা বলল বলে আমরা নিলাম বটে...”
বাপ্পা বলল “কীসের বাড়াবাড়ি? একটা মেয়েকে ওভাবে মাঝ রাস্তায় ফেলে চলে যাওয়া সম্ভব?”
শুভায়ু বলল “অসম্ভবও কিছু না। দেখ ভাই, ওসব আবেগে ভেসে অনেক কথা বলা যায়। বাস্তবটা মোটেও এত সহজ না। তোদের বাড়িতে সকাল বিকেল পুজো হয়। তোর বাবা ওরকম রাগী। পারবে ভিন ধর্মের একটা মেয়েকে মেনে নিতে?”
বাপ্পা একটু ফিউজ হল কয়েক সেকেন্ডের জন্য। তারপর জ্বলে উঠে বলল “দরকার হলে ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও বাড়ি ভাড়া করে থাকব”!
শুভায়ু বলল “বেড়াতে এসেছিস নিজের টাকায়? সেটাও তো বাপের থেকেই আনতে হয়েছে।”
বাপ্পা বলল “ও ঠিক একটা না একটা কিছু হয়ে যাবে”।
তন্ময় বলল “ওরম মনে হয় মামা। বেড়াতে এসেছ, ঘুরছ, পাহাড় দেখছ, খাদ দেখছ, ঐ দেখো, পাহাড়ে থেকে যাওয়ার কথা ভেবো না। তাহলেই কেস খাবে”।
শুভায়ু বলল “আর ধর মেয়েটার ঐ ভেগে যাওয়া আশিক তোর পোদে হুড়কো দিতে চলে এল? তখন কী করবি?”
বাপ্পা হকচকিয়ে গিয়ে বলল “ওই কাপুরুষটা আসবে কেন? সে তো ভেগে গেছে”!
শুভায়ু বলল “ভেগে গেছে না ছাতা! দেখা গেল সবই ছক করে রাখা। ইচ্ছা করে পালিয়েছে। তোকে ট্র্যাপে ফেলবে তারপর এসে ব্ল্যাকমেল করবে”।
বাপ্পা ঘাবড়ে গিয়ে বলল “ব্ল্যাকমেল করতে যাবে কেন খামোখা? আমি কী করেছি যে আমাকে ব্ল্যাকমেল করবে?”
তন্ময় বলল “দূরে থাকতে বলছি তাই থাক। বেশি চুদুরবুদুর করিস না, ভাল থাকবি”।
বাপ্পা কয়েক সেকেন্ড ঘোঁৎ মেরে বসে থেকে তেড়ে ফুড়ে উঠে বোতলটা বের করে গ্লাসে ঢেলে র খেয়ে নিল খানিকটা। বলল “জীবনে দুঃখই থেকে গেল ভাই। সেই কলেজে একটা মেয়েকে ঝাড়ি মারছিলাম ফার্স্ট ইয়ারে। আমাকেও মারছিল। ক'দিন পর দেখি এনগেজ। এখানে একটাকে যাও বা ভাবলাম ভগবান পাঠিয়েছেন আমার জন্য, তোরা আবার চুলকাতে শুরু করে দিয়েছিস। আমার কী একটু ভাল দেখতে পারিস

না তোরা?"
শুভায়ু বলল "ভাল দেখতে চাই বলেই তো বোঝাচ্ছি। নইলে আমাদের কী! পরের ছেলে পরমানন্দ যত গাঁড় মারায় তত আনন্দ। দে মদ দে"।
গ্লাসে হুইস্কি আর জল মিশিয়ে খেতে শুরু করল শুভায়ু। কয়েক সেকেন্ড পরে তন্ময়ও। বাপ্পা ঋজুকে ডাকল "আয় রে ভাই, ওসব ছোঁয়া ছুয়ি শপথ টপথ অনেক ঢপবাজি হবে, এখানে এই শীতের রাতে দু তিন পেগ চড়া, দেখবি জীবনটাই অন্য রকম হয়ে যাবে"।
ঋজু গম্ভীর হয়ে বলল "তোরা খা। জ্বালাতন করিস না"।
বাপ্পার একটু চড়েছিল। সে ঠোঁটে তর্জনী দিয়ে বাকিদের বলল "চুপ, চুপ, বাবু কথা দিয়েছেন"।
ঋজুর হাতের কাছে টিভির রিমোট ছিল, ঋজু বাপ্পার দিকে ছুঁড়ে মারল। বাপ্পা বলল "ঐ দেখো, বাবুর গোসা হয়ে গেল। আচ্ছা বাবু, তোকে আর জ্বালাব না"।
কলিং বেল বাজল রুমের। বাপ্পা বলল "ঋজু দেখ তো, চাট এসেছে বোধ হয়"।
ঋজু বলল "তুই দেখ। অর্ডার না করে ওঠ"।
বাপ্পা হালকা টলছিল। ধীরে ধীরে উঠে দরজা খুলে তার চক্ষু চড়কগাছ হল। বাঁধন দাঁড়িয়ে আছে। সে প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে সামলাতে বলল "বলুন"।
বাঁধন বলল "আপনারা কাল কোথায় যাবেন একটু জানাবেন?"
বাপ্পা বলল "কুফরি যাব। আসুন আসুন ভেতরে আসুন"।
শুভায়ু তন্ময়ের দিকে রেগে মেগে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি গ্লাস বোতল খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিল।
বাঁধন ঘরে ঢুকে সোফায় বসল। বাপ্পা চুপ করে বাঁধনের সামনে গিয়ে বসল। তন্ময় হাসার চেষ্টা করল "আমরা তাস খেলছিলাম আর কী!"
বাঁধন বলল "আপনারা হুইস্কি খাচ্ছেন?"
বাপ্পা জিভ কেটে বলল "না না, ওসব ভদ্রবাড়ির ছেলেরা ছোঁয় নাকি? একদম খাচ্ছি না ওসব"।
বাঁধন বলল "ওহ। খেলে ভাল হত। যা স্ট্রেস যাচ্ছে..."
তন্ময় অবাক হয়ে বলল "আপনি খাবেন?"
বাঁধন বলল "হ্যাঁ। ওর সঙ্গে খেতাম মাঝে মাঝে"।
শুভায়ু বিনা বাক্য ব্যয়ে খাটের তলা থেকে বোতলটা বের করে বাপ্পাকে বলল "গ্লাস দে"।
ঋজু চান্দ্রেয়ীর সঙ্গে চ্যাটে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ করে বাঁধনের হাতে হুইস্কির গ্লাস দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

২০

বৃষ্টি নেমেছে, সৌরেন ম্যালেই ছিলেন। একটা বসার জায়গায় আটকে গেলেন। মাথায় ছাদটুকুই যা আছে, চারদিক থেকে হুহু করে হাওয়া আসছে। সৌরেনের মত অনেকেই আটকে আছেন।
জাতীয় পতাকা একা একা ভিজছে। সৌরেন খানিকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। হলদেটে আলোয় বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেও পতাকা যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত রকম ক্লেশ, দুঃখ, লজ্জা মেখেও যেন সবার উপরে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যত দেখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সৌরেন হঠাৎই কৈশোরে ফিরে গেলেন নিজের। মনে পড়ে গেল সে এক অদ্ভুত টালমাটাল সময় ছিল। বাড়ি থেকে স্কুলে যাবার পথে প্রায়ই কোথাও না কোথাও ঝামেলা হচ্ছে। কোথাও নকশালরা কাউকে খুন করে ফেলে রেখে গেছে, কোথাও বা পুলিশ কাউকে নকশাল ভেবে তুলে নিয়ে গেছে, সে আর ফেরেনি। তুমুল আতঙ্কের মধ্যে কাটত দিনগুলো। বাবা যতক্ষণ না বাড়িতে ফিরত ঠাকুমা বসে থাকত ঠায় বাড়ির বারান্দায়। এভাবেই দিন কাটতে কাটতে হঠাৎ একদিন ঝড় থেমে গেল। ছোট খাট ঝামেলা হত বটে সেই উত্তাল দিনগুলো কোথায়

যেন হারিয়ে গেল। বিরাট বড় করে স্বাধীনতা দিবস পালন শুরু হল তাদের পাড়ায়। স্যার বলেছিলেন দেশ মানে কী। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের মানে কী। পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ,

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন--
শক-হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন"।

তেরঙ্গা দেখে হঠাৎ করেই প্রবল আবেগসর্বস্বতায় ভুগতেন সে সময়টা। সে আবেগ প্রশমিত হল কালের নিয়মেই। প্রেম এল, বিয়ে করলেন, সংসারে প্রবেশ, ধীরে ধীরে স্বাধীনতা দিবস পরিণত হল আরেকটা ছুটির দিনে।

অনেক দিন পরে বৃষ্টিতে আটকে সৌরেন হঠাৎই অনুভব করলেন যে জায়গাটায় আটকে আছেন বৃষ্টিতে, তার সঙ্গে আটকে আছেন একটি পাঞ্জাবী পরিবার, এক দক্ষিণ ভারতীয় পরিবার এবং এক বাঙালি মুসলিম দম্পতি। বাঙালি দম্পতিটি সম্ভবত হানিমুনে এসেছে, ছেলেটি মেয়েটি গুজগুজ করে কথা বলে চলেছে। পাঞ্জাবী পরিবারের দুটো ছোট ছোট ছেলে মেয়ে তুমুল চ্যাচামেচি করছে, দক্ষিণ ভারতীয় পরিবারে আছে বাবা মা এবং এক কিশোরী। মেয়েটি পাঞ্জাবী বাচ্চাদুটির দৃষ্টি আকর্ষণের প্রবল চেষ্টা করছে কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না। তবে চেষ্টা ছাড়ছে না। খানিকদূরে উত্তর ভারতের প্রাচীনতম গির্জাগুলোর একটা ক্রাইস্ট চার্চ, মায়াবী আলোয় দাঁড়িয়ে আছে। সৌরেনের হঠাৎই মনে হল এই দৃশ্য বোধ হয় এদেশেই সম্ভব। এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলোর জন্য শত মালিন্য সত্ত্বেও তেরঙ্গাকে এখনও মাথা নত করতে হয় নি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে চারদিক অনুভব করতে করতে সৌরেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলেন। ঘোর ভাঙল মালিনীর ফোনে। ফোন ধরলেন সৌরেন "বল"।

মালিনী উদ্বিগ্ন গলায় বললেন "বৃষ্টি ধরল?"

সৌরেন বললেন "না, এখনও তো কোন লক্ষণ দেখছি না"।

মালিনী বললেন "তোমার খিদে পায় নি?"

সৌরেন বললেন "তা খানিকটা পেয়েছে। দেখি, আর মিনিট দশেক দেখব, সেরকম হলে বৃষ্টিতেই বেরিয়ে যাব"।

মালিনী বললেন "না না, কোন দরকার নেই, বরং দেখো কোনো দোকান থেকে ছাতা কিনতে পারো কী না। শীত পড়ছে তো, সোয়েটারে মানছে?"

সৌরেন বললেন "হ্যাঁ, চিন্তা কোর না। আমি আসছি তাড়াতাড়ি"।

ফোনটা রেখে সৌরেনের হঠাৎ অপরাধবোধ হল। মালিনীর কাছে ফেরা তো আসলে ঘরে ফেরাই। দিনের পর দিন তনয়ার সঙ্গে শুয়েছেন যখন, কখনোই এসব নিয়ে ভাবেন নি তিনি। এই জন্যই হয়ত বাইরে যাওয়াটা দরকার। নিজের সঙ্গে খানিকটা সময় কাটানো দরকার। অফিস-বাড়ি-অফিসের থোড় বড়ি খাড়া জীবন থেকে না বেরোলে নিজেকে দেখতে পাওয়া যায় না।

বাঙালি দম্পতির কথা কানে এল সৌরেনের। তাদের আলোচনার বিষয় ভূত বাংলো। ছেলেটি খুব উৎসাহ দেখাচ্ছে বৃষ্টি থামলেই ভূত বাংলোর কাছে গিয়ে ভূত দেখার চেষ্টা করবে, মেয়েটি ভয় পেয়ে গেছে। ছেলেটি বুঝেছে মেয়েটি ভয় পাচ্ছে, সে আরও বেশি করে উৎসাহ দেখাচ্ছে।

পাঞ্জাবী বাচ্চাদুটোর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় কিশোরীটির বন্ধুত্ব হয়েছে অবশেষে। তারা কিশোরীর মোবাইলে কার্টুন দেখছে এক সঙ্গে।

বৃষ্টি পুরোটা না ধরলেও সামান্য ধরেছিল।

সৌরেন তার মধ্যেই বেরোলেন। ম্যালের দোকানপাটের ঝাঁপ বন্ধ শুরু হয়েছে।

সৌরেন একটা দোকান থেকে ছাতা কিনে নিলেন। হাঁটতে হাঁটতে হোটেলের দিকে রওনা দিয়েছিলেন হঠাৎ করেই একজনকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন।

২১

"ভালবাসতে হলে ধক থাকা দরকার"।
শুভায়ুর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে বাঁধন বলল।
বাপ্পা দু পেগ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শুভায়ু মদ খেলে একের পর এক সিগারেট খেয়ে যায়। তন্ময় এক পেগ খেয়ে বলেছে অনেক খাওয়া হয়ে গেছে। কম্বলের তলায় মোবাইল নিয়ে সেঁধিয়েছে। বাঁধন পাঁচ ছ পেগ খেয়ে ফেলেছে। ঋজু মদ খায় নি। বাঁধনের কথাটা শুনে সচকিত হয়ে বলল "আমায় বললেন?"
বাঁধন বলল "ঐ আর কী! নিজেকেই বলছি। কেমন অসহায় অসহায় টাইপ একটা ব্যাপারে ফেঁসে গেলাম! যার সঙ্গে পালাব বলে বাড়ি ঘর ছেড়ে এলাম, সেই আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল"।
ঋজু কী বলবে বুঝতে পারল না। চুপ করে থাকল। শুভায়ু বাঁধনকে বলল "আপনি আর খাবেন না। এরপর সামলাতে পারবেন না"।
বাঁধন হাসল, সিগারেটে টান দিয়ে বলল "সব সামলে নেব। এত বড় একটা ধাক্কা যখন সামলে নিয়েছি, আর কী হবে?"
তন্ময় কম্বলের তলা থেকে বলল "আচ্ছা আমরা তুমি করে বলছিলাম না? হঠাৎ করে আপনি তে শিফট করে গেলাম কবে?"
বাঁধন বলল "হবে হয়ত। তুমি বা আপনি একটা কিছু বললেই তো হল। কমিউনিকেশনটা হলেই হল"।
তন্ময় বলল "তোমার কথাটার সঙ্গে আমি একমত। ভালবাসতে হলে ধক থাকা দরকার। নইলে চপ বেচা ভাল। আমার এক বন্ধু জানো তো, তার ভালবাসা এমন, গার্লফ্রেন্ড বেড়াতে বেরিয়েছে বলে তাকে পাহারা দিতে বন্ধু বান্ধব নিয়ে নিজেও বেরিয়ে গেছে"।
তন্ময় কথাটা বলেই ঋজুর দিকে চোখ মিটমিট করে তাকাল।
ঋজু রাগল না। বলল "এতে সমস্যা কোথায়?"
তন্ময় বলল "সমস্যা হল তোর ধক থাকলে নিজেই মেয়ের বাবার সামনা সামনি হয়ে কথা বলে নিতি"।
ঋজু বলল "ফার্স্ট স্যালারিটা পেয়ে নি। ঠিকই বলব"।
শুভায়ু সিগারেটের রিং বানাতে বানাতে বলল "দেখা যাবে। এই লুকোচুরি খেলায় হাঁফ ধরে গেল মাইরি। নেহাত মানালিটা দেখা হয় নি বলে তাই, নাহলে আমায় কি পাগলা কুকুরে কামড়ে ছিল যে আমি তোর এই কাজের জন্য বেড়াতে চলে আসব?"
বাঁধন গ্লাসে চুমুক দিয়ে ঋজুর দিকে তাকাল "তুমি সত্যিই লাকি। এই সময়ে দাঁড়িয়েও তিন জন বন্ধু পেয়েছে। আজকাল তো একজন বন্ধুও পাওয়া যায় না। পাশে থাকার লোকের কথা তো ছেড়েই দিলাম। তোমরা ভাগ্যবান, কিংবা তোমার প্রেমিকা। সেও ভাগ্যবতী"।
ঋজু বলল "এখন যদি ছেলেটা হঠাৎ করে তোমার সামনে চলে আসে তাহলে কী করবে?"
বাঁধন কথাটার উত্তর না দিয়ে চুপ করে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে বলল "যতবারই আমাদের ঝগড়া হত, সে যে কোন কারণেই হোক, আমার রাগ ভাঙানোর জন্য ফোনের পর ফোন, মেসেজের পর মেসেজ করে যেত। আর এখন ফোনই অফ করে রেখে দিয়েছে। সুতরাং ফিরে আসবে, সে সম্ভাবনাই আসছে না"।
ঋজু বলল "অন্য ধর্মে প্রেম করেছো, কোন দিন মনে হয় নি ভুল হয়ে গেছে?"
বাঁধন বলল "আমার মাথায় তো কখনই সেসব আসে নি। তাছাড়া ও নিজেকে নাস্তিক বলত"।
তন্ময় লেপের তলা থেকে বলল "নাস্তিক অনেক রকমের হয়। আমি এক ধরণের নাস্তিক চিনি সারাক্ষণ বড় বড় বুকনি ঝাড়ছে আর শনি মন্দিরের সামনে দিয়ে গেলেই চারদিক দেখে টুক করে প্রণাম সেরে নিচ্ছে।

যারা কথায় কথায় নিজেকে নাস্তিক প্রমাণ করার চেষ্টা করে যায়, আসল সময়ে দেখা যায় তার মত ধর্মভীরু দ্বিতীয়টি নেই"।
শুভায়ু অবাক হয়ে তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলল "তুই এত কথা জানলি কোত্থেকে?"
তন্ময় বলল "ছোটবেলা থেকে বাড়িতেই দেখে আসছি ভাই। ছোঁয়াছুয়ি, মাছ মাংস না খাওয়া, আর বাতেলা দিয়েও যেমন ধার্মিক হওয়া যায় না, তেমনি নাস্তিকের ভেক ধরে অনেকেই প্রগতিশীল সাজে। আসলে তারা যে কতটা কনজারভেটিভ তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। কত লোককে দেখলাম নাস্তিক সেজে পুজো সেরে এল বা হজ করে চলে এল"।
শুভায়ু বলল "আসল কথাটা বল না ভাই, ধর্ম নিয়ে কচকচির ধুয়ো তুলে আসলে আসল সমস্যাগুলোকেই ঢাকা দেওয়া হচ্ছে। এই তো, বাঁধনদের সমস্যাটা তো ধর্মের জন্য না। ছেলেটার কাছে টাকা ছিল না বলে ইনসিকিউর হয়ে পড়েছিল"।
বাঁধন চুপ করে দুজনের কথা শুনছিল। হঠাৎ সে উঠে পড়ল "আমি রুমে যাই, কাল সকালে দেখা হবে"।
ঋজু বলল "চল, এগিয়ে দি"।
বাঁধন একটুও না টলে দৃঢ় পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
বাঁধন নিজের ঘরে ঢুকে গেলে ঋজু ফিরে এসে তাদের রুমের দরজা বন্ধ করল।
শুভায়ু বলল "মামণি ভালই টানতে পার। আমি এতটা টানলে অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হত"।
বাপ্পা ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসে বলল "ভাই বাপ যদি জানে আমি মুসলিম মেয়ে বিয়ে করব, জুতিয়ে বাপের নাম খগেন করে দেবে"।
তন্ময় বলল "তুই হালকা মুতে ঘুমিয়ে পড় বোকচোদ। লোকের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই তোর মত ছাগলকে বিয়ে করবে"।
বাপ্পা করুণ চোখে তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলল "করবে না না?"
তন্ময় দুদিকে মাথা নেড়ে বলল "কোন চান্স নেই"।
বাপ্পা আবার শুয়ে পড়ে বলল "ভালই হল, তাহলে বাবার জুতোও খেতে হবে না"।

২২

রাত দশটা বাজে।
সকালে বোঝা যায় নি শীত কেমন পড়তে পারে। এখন বেশ ঠান্ডা লাগছে।
সৌরেন ফিরেছেন খানিকক্ষণ আগে। মালিনী আর চান্দ্রেয়ী টিভি দেখছিল।
সৌরেন চেঞ্জ করে নিলেন তাড়াতাড়ি। ভিজেছিলেন খানিকটা। মালিনী বললেন "জ্বর বাঁধাবে না তো?"
সৌরেন হাসলেন "তুমি ভুলে গেলে ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবল খেলা পাবলিক আমি"।
মালিনী মুখ বাঁকালেন "সে কি আজকে নাকি! কবে খেলেছ তার গুণ এখনও থাকবে নাকি?"
সৌরেন বললেন "নিশ্চয়ই থাকবে। ডিনারে কী খাবে?"
মালিনী চান্দ্রেয়ীর দিকে তাকালেন "কীরে? চিকেন তো?"
চান্দ্রেয়ী মাথা নাড়ল।
সৌরেন বললেন "রুম সার্ভিসে বলে দি? ঘরে এসে দিয়ে যাক"!
মালিনী আঁতকে উঠলেন "না না, ভাত খাওয়া ঠিক হবে না ঘরে। পকোড়া খেয়েছি ঠিক আছে। চল ডাইনিং রুমে যাই"।
সৌরেন কিছু বললেন না। তার ডাইনিং হলে যেতে ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু যেতেই হবে।
মিনিট দশেকের মধ্যে সবাই তৈরী হয়ে বেরোলেন। তাদের ফ্লোর মাইনাস থ্রি। ডাইনিং রুমে যেতে হলে গ্রাউন্ড ফ্লোরে মানে জিরোতে যেতে হবে। লিফটে উঠে মালিনী বললেন "পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো এদের

রান্নাঘরটা? দেখেছিলে?”
সৌরেন বললেন “হ্যাঁ। এই সব হোটেলে অনেক স্ট্যান্ডার্ড মেন্টেন করা হয়। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো”।
মালিনী বললেন “ক’দিনের তো ব্যাপার। যা হবে হবে। জেলুসিল খেয়ে নেব আর কী হবে”।
চান্দ্রেয়ী চুপ করে ছিল। বাবা যখন থেকে ঋজুর ব্যাপারে জানতে চেয়েছে সে একেবারে কাঁটা হয়ে আছে। মনে হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি বেড়ানোটা শেষ হয়ে কলকাতা ফিরে যাওয়া যায় তত মঙ্গল। কোত্থেকে খবর পেয়েছে, কে ঋজু সম্পর্কে বাবাকে জানিয়েছে কিছুই বুঝতে পারছিল না সে।
ডাইনিং রুমে গিয়ে দেখা গেল হৈ হৈ ব্যাপার। কন্ডাকটেড ট্যুরে যারা গেছে তারা খেতে বসেছে সারি বেঁধে। তাদের জন্য অবশ্য আলাদা টেবিল ছিল। তারা বসল।
গরম ভাত, আলু পটলের তরকারি, ডাল, পাঁপড় ভাজা, মুরগীর মাংস পরিবেশন হচ্ছে। দু চারটে বাচ্চা আছে। তাদের খাওয়াতে গিয়ে তাদের মায়েরা হোটেল মাত করছে। দু চারজন যুবক মুখে মাফলার বেঁধে সন্দেহজনক ভঙ্গিতে যাতায়াত করছে। সৌরেন দেখেই বুঝলেন এই ছেলেগুলো হচ্ছে বোতল পার্টি। এদের কাজ হল একটা প্লাস্টিকের গ্লাসে করে মাংস সরিয়ে নিয়ে গিয়ে রুমে গিয়ে মদ গিলবে। কোন কোন ফ্যামিলিতে আবার বউরা এগুলো মেনে নেয় না। তারা তুমুল গম্ভীর হয়ে থাকে। কন্ডাক্টেড ট্যুরের ম্যানেজার মেয়ের বিয়েতে পরিবেশনের মত করে খাবার দিচ্ছেন। একজায়গায় এক বয়স্ক লোককে দেখা গেল বেশ রাগী রাগী ভঙ্গিতে উষ্মা প্রকাশ করছেন “কোন ব্যাটাচ্ছেলে আমায় শক্ত পিস দিয়ে গেলি রে? আমি খেতে পারি শক্ত পিস? বুড়ো হলে বুঝতে পারবি বাঁধানো দাঁতে মাংস খেতে কেমন লাগে”।
ম্যানেজার একটা ছেলেকে ধমক দিল। ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে দাদুর পাতে মাংস দিতে চলে গেল।
ওয়েটার চলে এসেছিল। মালিনী সৌরেনকে বললেন “ভাগ্যিস আলাদা বেড়াতে এসেছি। এখানে এসেও যদি সেই বাঙালি খাবারই খেতে হত তাহলে হয়েছিল”।
সৌরেন বললেন “কী খাবে?”
মালিনী বললেন “তন্দুরি রুটি আর চিকেন বল। মামণ কী খাবি?”
চান্দ্রেয়ী বলল “ভাত”।
সৌরেন বললেন “আমিও ভাত খাই। চিকেন আর ডাল বলে দি”।
অর্ডার হয়ে গেলে মালিনী ফিসফিস করে বললেন “এদের হোটেলে এভাবে অ্যালাউ করে কীভাবে?”
সৌরেন বললেন “একসাথে এতগুলো লোক, হোটেলের লাভ নেই ভাবছ? তাছাড়া এখনও গরমের ছুটি পড়েনি। সেরকম ভাবে সিজনও নেই। ওরা এখন অ্যালাউ করবে বড় পার্টি। লস নেই তো কোন”।
এক ভদ্রমহিলা খেতে খেতেই তার পাশে বসা বাচ্চাটিকে দুম দুম করে কিল কষিয়ে দিলেন। বাচ্চাটি সম্ভবত খাচ্ছিল না। কিল খাবার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটা চিল চিৎকার জুড়ে দিল। ভদ্রমহিলার চেহারা সুমো রেসলারদের মত। পাশে বসা স্বামীটিকে তার পাশে বেশ অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে। ভদ্রলোক হঠাৎ এই ঘটনায় যে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু স্ত্রীকে ভয় পান। হালকা করে বলতে গেছিলেন “আহা আবার এসব কেন”, কিন্তু স্ত্রীর রোষকষায়িত নেত্রের সামনে পড়ে চেপে গেলেন। চিকেনের পিস নিয়ে ক্রুদ্ধ বৃদ্ধটি অবশ্য এসব ব্যাপারে বিশেষ নজর দেন নি। তিনি চোখ বুজে নিবিষ্ট মনে মাংস চিবিয়ে যাচ্ছেন। বোঝাই যাচ্ছে এসব তুচ্ছ ব্যাপার তাকে বিশেষ স্পর্শ করতে পারে না।
ম্যানেজারের প্রথম দিনেই গলা বসে গেছে। পাঁপড় শেষ হয়ে গেছিল। কেউ একজন পাঁপড় চাইতেই ম্যানেজার বাঁশ ফাটা গলায় “ওরে পাঁপড় ভাজ, পাঁপড় ভাজ” বলে চ্যাঁচ্যাতে শুরু করে দিয়েছে।
মালিনী বললেন “উফ, খাওয়া তো না, যেন সার্কাস চলছে”।
সৌরেন বললেন “আস্তে কথা বল। শুনতে পাবে”।
মালিনী গজগজ করছিলেন।
তাদের খাবার চলে এসেছিল। সব খাবারই গরম। ধোঁয়া উঠছিল।

কন্ডাকটেড ট্যুরের গ্রুপের একটা ছেলে অনেকক্ষণ ধরে চান্দ্রেয়ীকে ঝাড়ি মারছিল।
অন্য সময় হলে চান্দ্রেয়ীও দু চারবার ঝাড়ি মেরে ছেলেটার মনে আশা জাগাত।
এবারে মন মেজাজ খাবার ছিল।
সে চুপচাপ খাবারে মন দিল।

২৩

আগের দিনের পথশ্রম সত্ত্বেও পরের দিন ঋজুর ঘুম ভেঙে গেল ভোর ছ'টায়। বেশ খানিকক্ষণ এ পাশ ওপাশ করে উঠে বসল ঋজু। ঘরময় মদ আর সিগারেটের গন্ধ, মেঝেতে বোতল পড়ে আছে। মাংসের হাড়ের প্লেট মেঝের মধ্যেই। ঋজুর উঠেই প্রবল অস্বস্তি হল। সে তড়িঘড়ি বাথরুমে ঢুকল।
মিনিট দশেক বাদে বাথরুম থেকে বেরিয়েও বুঝতে পারল রুমে থাকা এখন অসম্ভব। বাপ্পা, তন্ময় শুভায়ু সবাই মড়ার মত ঘুমোচ্ছে। ঋজু যতটা সম্ভব আওয়াজ কম করে একটা জ্যাকেট আর মাফলার পরে রুম থেকে বেরোল। করিডর ধরে খানিকটা হেঁটে লিফট না নিয়ে সিঁড়ি ব্যবহার করল। কলকাতায় মর্নিং ওয়াকের অভ্যেস আছে তার। ভোর বেলা একা একা শহরের রাস্তায় হেঁটে বেরনোর একটা আলাদা ব্যাপার আছে। পাহাড় আর সমতল যদিও আলাদা তবু ভোরের গন্ধটা ঋজুর বড় প্রিয়।
গতরাতের বৃষ্টির পরে আশ্চর্যজনকভাবে এখন আকাশ একেবারেই মেঘমুক্ত। ঠিক যেমন পাহাড়ের মন হয়। এই দুঃখী তো এই প্রবল খুশি।
হোটেল থেকে মিনিট পাঁচেক হাঁটার পরেই তার চোখ পড়ল বাঁধনের ওপর। একা একা উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটছে বাঁধন। ঋজু পা চালিয়ে বাঁধনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল "একী! তুমি কোথায় যাচ্ছ?"
বাঁধন কয়েক সেকেন্ড তার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে হঠাৎ করে সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলল "সারারাত ঘুমাতে পারি নি। ভোর হতেই বেরিয়ে পড়েছি"।
ঋজু অবাক হয়ে বলল "অতটা মদ খেয়েও ঘুম হয় নি?"
বাঁধন মাথা নাড়ল "নাহ, ভেবেছিলাম ঘুম আসবে হয়ত খাওয়ার পরে। কিছুই এল না। শেষ রাতে বমি করলাম"।
ঋজু বাঁধনের দিকে তাকাল, চোখের তলায় ব্ল্যাক সার্কেল স্পষ্ট। সে একটু ভেবে বলল "তুমি হোটেলেই যাও। এভাবে ঘুরলে আরও ক্লান্ত হয়ে পড়বে"।
বাঁধন হাসল "ভয় পাওয়ার দরকার নেই, আমি পালাব না। আপাতত এই বিশ্ব সংসারে তোমাদের মত ভদ্র লোকজন আর নেই, যারা একটা মেয়েকে একা পেয়েও কোন রকম অসভ্যতা করে নি। আমি কোথাও যাচ্ছি না"।
ঋজ এবার হাসল। বলল "তবু, এভাবে ঘুরে বেরিয়ে জ্বর-জারি বাঁধালে সেটা সবার ক্ষেত্রেই খারাপ হবে। তখন আমাদের ট্যুরটার বারোটা বেজে যাবে যে"।
বাঁধন বলল "না না, তুমি জানো না, মেয়েদের সহ্যশক্তি অনেক বেশি। দেখলে না কেমন টেনে দিলাম কাল? নিশ্চিন্ত থাকো, আমার কিছু হবে না। চল খানিকটা হাঁটি বরং"।
ঋজু কাঁধ ঝাঁকাল "অগত্যা"।
তারা রাস্তার ধারের রেলিং বরাবর হাঁটছিল। সূর্যের আলোয় ধীরে ধীরে শহরটা ফুটে উঠছে, বাঁধন কয়েক সেকেন্ড সেদিকে মুগ্ধ ভাবে তাকিয়ে বলল "কী সুন্দর না? ইচ্ছা করে যেন সব ভুলে যাই, যেন কিছুই হয় নি"।
ঋজু উত্তর দিল না। চুপ করে হাঁটতে লাগল।
বাঁধন কয়েক মিনিট চুপচাপ হাঁটার পরে বলল "তোমার গল্পটা যে টুকু শুনে বুঝলাম সবার থেকে, তোমার গার্ল ফ্রেন্ড এখানে বেড়াতে এসেছে বলেই তুমিও এসেছ। বেশ ইন্টারেস্টিং এবং রোম্যান্টিক কিন্তু

গোটাটাই"।
ঋজু হাসল "আসলে আমি হয়ত একটু বেশিই পজেসিভ"।
বাঁধন বলল "সেটা তো খুবই ভাল। পজেসিভই বা ক'জন হয় আজকাল?"
ঋজু বলল "কিন্তু অনেকেই বলে এই পজেসিভনেসটা আসলে ইনসিকিউরিটি থেকে আসে"।
বাঁধন ঋজুর দিকে তাকিয়ে বলল "তাই? তুমি ইনসিকিওর?"
ঋজু খাদের দিকে তাকিয়ে একটু দাঁড়াল "হব হয়ত খানিকটা। এখন তো ওর বাবাও জেনে গেছেন। গোটা ব্যাপারটা ঘেঁটে যাবার চান্স আছে। এত সব কিছুর মধ্যেও ইনসিকিউরিটি যদি না আসে তবে আর কবে আসবে?"
বাঁধন একটু বিষণ্ণ গলায় বলল "পজেসিভ হয়েও আসলে কোন লাভ হয় না জানো তো? যার থাকার, সে ঠিকই থাকবে। আর যার যাবার, তাকে তুমি সর্বস্ব দিয়ে দিলেও সে ঠিকই তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে। তাকে কোনভাবেই তুমি আটকাতে পারবে না। এটা হবেই"।
ঋজু উত্তর দিল না। একটু জোরে জোরে হাঁটতে লাগল। বাঁধনও হাঁটছিল। বেশ খানিকক্ষণ হেঁটে ঋজু রাস্তার পাশের একটা বেঞ্চে বসল। বাঁধনও বসল।
বাঁধন বলল "আমার বাবা কোথাও বেড়াতে নিয়ে যেতে চায় না জানো। খুব ইচ্ছা ছিল ওর সঙ্গে ক'দিন পাগলের মত ঘুরব। তারপর..."
বাঁধন চুপ করে গেল।
ঋজু বলল "তারপর?"
বাঁধন বলল "থাক। বারবার এক কথা বলে নিজেকে আর দুর্বল করতে চাই না। ভাল লাগছে না"।
ঋজু বলল "তুমি রিলিজিয়াস?"
বাঁধন বলল "খুব না, আবার একেবারে না তাও না। তুমি?"
ঋজু বলল "জানি না"।
বাঁধন বলল "হঠাৎ এই প্রশ্ন করছ কেন?"
বাঁধন উঠল। ঋজুও উঠে হাঁটতে শুরু করল।
ঋজু বলল "তোমার কি মনে হয় না কেউ যদি সত্যি তোমাকে দূর থেকে লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে তোমার সঙ্গে যা হয়েছে তা তোমার ভালর জন্য হয়েছে? হয়ত ছেলেটার সঙ্গে বিয়ে হলে অন্য কোন সমস্যার মুখোমুখি হতে হত তোমাকে! হয়ত আরও ভাল কেউ সত্যিই অপেক্ষা করে আছে তোমার জন্য?"
বাঁধন বলল "তুমি সবটা জানো না, তাই বলতে পারছ সহজে। কিছুদিন আগে আমাকে একজন দেখতে এসছিলেন। ভদ্রলোক আমার কুড়ি বছর বড়। এই ব্যাপারটাকে তোমার মনে হতে পারে ভাল কেউ অপেক্ষা করে থাকবে আমার জন্য? আমি বাড়ি ফিরব, বাবা ক'দিন আমার সঙ্গে কথা বলবে না, হয়ত মার ধোরও খাব, হয়ত মেরেও ফেলতে পারে, কিংবা ঐ লোকটার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দেবে। চিনি না জানি না একটা লোকের সঙ্গে আমার গন্ডা খানেক বাচ্চা হবে..."
বাঁধন একটানা অনেকটা বলে চুপ করে গেল।
ঋজু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার ফোন বেজে উঠল।
সে দেখল চান্দ্রেয়ী ফোন করছে। ধরল "গুড মর্নিং"।
"যে মেয়েটার সঙ্গে বসে গল্প করছ সে কে?"
চান্দ্রেয়ীর থমথমে গলাটা শুনে ঋজু চমকে উঠল। পরক্ষণেই খেয়াল পড়ল তার, হাঁটতে হাঁটতে তারা চান্দ্রেয়ীদের হোটেলের সামনে চলে এসেছিল।

২৪
“ভাই জীবনের এইডস হয় না?”
ব্যাজার গলায় জিজ্ঞেস করল বাপ্পা।
শুভায়ু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল “মানে?”
বাপ্পা বলল “এই যে, জীবন কন্ডোম ছাড়াই আমার মত দুর্ভাগাদের আগা পাস্তালা মেরে যাচ্ছে, তাতে এইডস হয় না?”
শুভায়ু বলল “কেন তোকে মেরেছে বলে মনে হচ্ছে কেন তোর?”
বাপ্পা বলল “এই যে, ঋজু, বাপের টাকা আছে, নিজের চাকরিরও সিওরিটি আছে, একটা ছমিয়া আছে, আরেকটা ছমিয়া তুলে ফেলল, দিব্যি মর্নিং ওয়াক করে এল, গুজগুজ করে কথাও বলছে কত মামণির সাথে, আর আমাকে দেখ, বাপ তো না, যেন মোগাম্বো আর তিন চারটে হোয়াইট ওয়াকারকে মিক্সিতে মিস্ক করে ভগবান বাপ হিসেবে পাঠিয়েছে, এইচ এসে ভাবলাম অ্যাকাউন্টেন্সির চোতাগুলো মিলে যাবে, একটাও মিলল না, লাইফে না আছে কোন হিরোইন, একটা সাইড রোল পাঁচ মিনিট অ্যাপিয়ারেন্স মামণিও পেলাম না ভাই, এর পরও বলবি জীবন আমাকে মারে নি? আর কী কী হলে তোর মনে হত আমায় মারে নি ভাই?”
শুভায়ু জোরে হেসে উঠল।
সকাল সাড়ে দশটা। তারা কুফরি ছাড়িয়ে একটা অ্যামিউজমেন্ট পার্কে এসেছে। বিভিন্ন রকম স্পোর্টস ইভেন্ট হচ্ছে, ঋজু আর তন্ময় গো কারটিং করছে, বাঁধন একটু দূরে চুপচাপ বসে আছে।
বাপ্পা শুভায়ুর হাসি শুনে বলল “হাসছিস কেন ভাই? পরের দুঃখে হাসলে হবে সব সময়? একটু টিপস দে”।
শুভায়ু বলল “কথাই তো আছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। মামণি তো এখন একা বসে আছে, যা না, গিয়ে দেখ না কিছু করতে পারিস নাকি!”
বাপ্পা মুখ কালো করে মাথা নেড়ে বলল “লাভ নেই ভাই। বুঝতে পারি। এখন স্লগ ওভার হয়ে গেছে, চার বলে চল্লিশ রান বাকি। আমি কেন, কেউ কিছু করতে পারবে না। ও ঋজুই তুলে নেবে দেখবি। দিয়ে দুই বগলে দুটো মামণি নিয়ে ঘুরবে”।
শুভায়ু একটু রাগল “আচ্ছা, এত সুন্দর একটা জায়গায় এসেছিস, এত ভাল ওয়েদার, কী সুন্দর পাহাড় টাহাড় দেখা যাচ্ছে, কোথায় একটু ছবি টবি তুলবি তা না, এক মামণি মামণি করে যাচ্ছিস কেন? ঝাঁট জ্বালাস না তো! হয় ওর সাথে কথা বল গিয়ে, নইলে এখানে চুপ করে বসে থাক। ঝাঁট জ্বালাস না”।
বাপ্পা খানিকক্ষণ গোঁ মেরে বসে থাকল। তারপর পকেট থেকে ছোট চিরুণি বের করে মন দিয়ে চুল আঁচড়ে বাঁধনের বেঞ্চিতে গিয়ে বসল “তুমি কখনও গো কারটিং করেছ?”
বাঁধন বলল “না”।
বাপ্পা বলল “ইচ্ছা করে না?”
বাঁধন বলল “ইচ্ছা করলেই কি করা যায়? ইচ্ছা তো অনেক কিছুই করে। মেয়ে হয়ে জন্মালে অনেক ইচ্ছাতেই বালি চাপা দিয়ে দিতে হয়”।
একটা মেয়ে জিপ লাইনিং করছিল, বাপ্পা সেদিকে দেখিয়ে বলল “ঐ তো, ঐ দেখো একটা মেয়ে দড়ি বেয়ে সুরুত করে চলে গেল, ও কী করে করছে?”
বাঁধন বলল “সিম্পল, সব মেয়ে ওর মত লাকি হয় না বলে”।
বাপ্পা এ কথার উত্তরে কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল “ও”। মিনিট তিনেক কথা না পেয়ে চুপ করে বসে থাকল বাপ্পা।
তারপরে ঋজু আর তন্ময়কে গো কারটিং করতে দেখে বলল “ঋজুর তোমাকে বলা উচিত ছিল। তন্ময়কে

নিয়ে চলে গেল"।
বাঁধন হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বাপ্পার দিকে ফিরে তাকাল "কেন? ঋজুর আমাকে বলা উচিত ছিল কেন?"
বাপ্পা ঘাবড়ে গেল, আমতা আমতা করে বলল "না মানে, এমনি মনে হল। আমি ওরকম কিছু ভেবে বলি নি"।
বাঁধন বলল "শোন, দূর থেকে কোন কিছু দেখে হঠাৎ করে যারা কোন ডিসিশনে চলে আসে তাদের মূর্খ বলা হয়। আমি বুঝতে পারছি, তুমি ঋজুকে আর আমাকে নিয়ে কিছু একটা বোঝাতে চেষ্টা করছ। ব্যাপারটা আদৌ সেরকম নয়। একটা ছেলে আর মেয়ে কথা বললেই তাদের মধ্যে কোন কেমিক্যাল রি অ্যাকশন শুরু হয়ে যায় না এটা তোমাকে বুঝতে হবে। তাছাড়া ঋজু অলরেডি একটা সমস্যায় আছে। এসব কথা ভেবে বা বলে সেসব আর বাড়িও না"।
বাপ্পা হাঁ করে বাঁধনের হঠাৎ রাগে ফেটে পড়াটা দেখছিল। বাঁধনের এতগুলো কথার উত্তরে সে প্রায় তিরিশ সেকেন্ড ঐ একই ভঙ্গিতে বাঁধনের দিকে তাকিয়ে বলল "ও"।
বাঁধন বলল "তোমার গো কারটিং করতে ইচ্ছা করছে?"
বাপ্পা জোরে জোরে দুদিকে মাথা নাড়াল "না"।
বাঁধন উঠে পড়ল "আমার করছে। তোমার ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে যেতে পারো। যাবে?"
বাপ্পা হাঁ করে বাঁধনের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না বাঁধন এই প্রস্তাবটা তাকে দিতে পারে।

২৫

"লজ্জার মাথা খেয়েছে ছেলে। বুঝতে পারছ?"
"তা তো বুঝতে পারছি। ছি ছি ছি ছি। এ ছেলেকে আমি পেটে ধরেছি ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে"।
"ওভাবে এখন বসে থাকলে হবে রামুর মা? যাও যাও, গিয়ে দরজা ধাক্কা দাও। সেই কাল সন্ধ্যে সাতটায় গিয়ে দোর দিয়েছে, এখনও খুলল না। সবাই হাসাহাসি করছে!"
"আমি কী করব? আমি তো ডাকলাম দুবার। আগে মা বলে ভক্তি ছেদ্দা যে টুকু করত, ঐ মেয়েছেলে ঘরে আসার পর সেটুকুও গেছে। ও মাগী কী বশ করেছে কে জানে। আর লোকে যেন বিয়ে করে না! আমাদেরই ভুল হয়েছে। কিছুতেই আমাদের আসা উচিত ছিল না"।
"ছেলেও তেমন। বিয়ের আগে আমার কাছে এসে খালি বলে বাবা মার জন্য ঝি আনব। মার হেন কষ্ট তেন কষ্ট চোখে দেখা যায় না আরও কত কী! এখন দেখো!"
"দোষ তো তোমার। শুরুতেই রাজি হয়ে গেলে কেন? প্রেমের বিয়ে বলেই মেনে নিতে হবে? তোমার না আছে একটু কী যেন বলে পারসোনাইটি না কী, না আছে একটু রাশভারি হবার ক্ষেমতা। এবার সামলাও। ছেলে বাপ মার সামনে গিয়ে বউকে নিয়ে ঘরে দোর দেবে তুমি বাইরে গিয়ে দোর পাহারা দিও"!
পাশে বসা দম্পতির নীচুস্বরে হাহাকার কানে আসছিল সৌরেনের। কুফরি যাবার কথা তাদের। মালিনী আর চান্দ্রেয়ী তৈরী হচ্ছিল। তিনি রিসেপশনে একটা সোফায় বসে কাগজ পড়ছিলেন।
পাশের পার্টি কন্ডাকটেড ট্যুরের। হাসি পাচ্ছিল সৌরেনের কথাগুলো শুনে কিন্তু হাসতে পারছিলেন না। গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন।
বয়স্ক ভদ্রলোক খানিকক্ষণ গজগজ করে বললেন "আমি যাচ্ছি। দেখি কী করে"।
ভদ্রমহিলা বললেন "দরকার নেই। তুমি থাকো। আমি যাই। ডেকে আনছি"।
ভদ্রলোক বললেন "যাও। আর না এলে বলে দাও ওদের বাদ দিয়েই আমরা চলে যাচ্ছি"।
ভদ্রমহিলা বললেন "তাই হবে"।
সৌরেনের ফোন বাজছিল। সৌরেন দেখলেন তনয়া ফোন করছে। হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে ফোন

ধরলেন "বল"।
"বউ নিশ্চয়ই পাশে নেই নইলে তো ফোন ধরতে না"।
তনয়ার খোঁচায় বিরক্ত হলেন সৌরেন। এই ধরণের খোঁচা মারাতেই তনয়া অভ্যস্ত বরাবর। মাঝে মাঝে অসহ্য বোধ হয়। এখন আরও বেশি হল কারণ এই মুহূর্তের ফ্রেমে তনয়াকে বড়ই বেমানান লাগছে তার। একটু থেমে বললেন "তোমারও নিশ্চয়ই অন্যান্য কাছের মানুষেরা পাশে নেই, সেই জন্যই ফোন করছ এখন"।
ওপাশ থেকে গলাটা এবার ঝাঁঝালো শোনাল "একটু মুখ সামলে কেমন?"
সৌরেন হাসলেন "ব্যাপারটা উভয় পক্ষে হলেই ভাল"।
"কী ব্যাপার বল তো তোমার? মুড অফ?"
সৌরেন বললেন "না, মাঝে মাঝে আমারও একটু আধটু কথা বলতে ইচ্ছা করে আর কী। সব সময় তুমিই কথা শোনাবে তা কী করে হয় বল?"
তনয়া বললেন "তা ঠিক"।
সৌরেন বললেন "কিছু বলবে?"
তনয়া বললেন "নাহ। খোঁজ নেবার জন্যই ফোন করেছিলাম"।
সৌরেন বললেন "বেশ। তাহলে রাখছি এখন"।
তনয়া বললেন "তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?"
সৌরেন বললেন "কর"।
তনয়া বললেন "তুমি কি একটুও আমাকে মিস করছ না?"
সৌরেন বিরক্ত হলেন। এই বয়সে এসে এই ধরণের ন্যাকামি করতে বড় বিরক্ত লাগে। কিন্তু সমস্যা হল কোন কোন সম্পর্ক এরকম ছোট ছোট ন্যাকামোর ভিত্তিতেই টিকে থাকে। তেতো হেসে বললেন "নিশ্চয়ই। মালিনী যখন পাশ ফিরে নাক ডেকে শোয় তখন তো তোমার কথাই মনে পড়ে। সেটাই তো স্বাভাবিক তাই না?"
তনয়া বললেন "তবু তুমি মালিনীকেই বেশি ভালোবাসো তাই না"?
সৌরেন বললেন "দাঁড়িপাল্লায় মাপি নি। কীভাবে বলি বল তো? তোমার কাছে যারা আমার অবর্তমানে আসে তাদের নিশ্চয়ই কেউ কেউ তোমাকে নিজের বউয়ের থেকেও বেশি ভালোবাসে।"
তনয়া বললেন "তুমি বার বার আমাকে আঘাত করে কথা বলছ কেন বলত? আমার ওপর এত রেগেই বা গেলে কেন? আমি বুঝতে পারি, এভাবেই একদিন তুমি আমাকে ছেঁটে ফেলার প্ল্যান করছ তাই না?"
সৌরেন বললেন "ছাঁটতে চাইলেই বা ছাঁটতে পারা যায় কি?"
তনয়া বললেন "চাও বুঝি?"
সৌরেন বললেন "এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। আচ্ছা শোন, আমি রাখি এখন, ওরা যে কোন মুহূর্তে আসবে"।
তনয়া বললেন "আমাকেও রাখতে হবে। বাজারে যাব। কিছুই নেই তেমন। শুধু মনে রেখো আমাকে ছেঁটে ফেলে অত সহজ না। তুমি চাইলেও আমি তোমাকে কোন দিন ছাড়ব না"।
তনয়া হঠাৎ গুনগুণ করে গেয়ে উঠলেন "তোমায় হৃদমাঝারে রাখব, ছেড়ে দেব না"।
সৌরেন বললেন "ওকে। ছেড়ো না। ধরে রাখো"।
তনয়া বললেন "রাখব তো। ছাড়বই না"।
সৌরেন বললেন "আর কতটাকা লাগবে সেটাও বলে দিও। ওটাই তো আসল"।
তনয়া কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। সৌরেন ফোনটা কেটে দিলেন।
হোটেলের ভেতর ঢুকে দেখলেন রিসেপশনে ভদ্রমহিলা ফিরে এসেছেন। সম্ভবত ব্যর্থ হয়েছেন হানিমুনে

আসা ছেলে আর ছেলের বউকে ঘর থেকে বের করতে। সৌরেন আবার হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামলেন। বিনা কারণেই জোরে হেসে উঠলেন।
কেন যে এত হাসি আসছে নিজেই বুঝতে পারছিলেন না।

২৬
আলু পরোটা আর চিকেন নেওয়া হয়েছে, কুফরি থেকে সিমলা ফেরার পথে একটা রেস্তোরাঁয় গাড়ি দাঁড়িয়েছে।
শুভায়ু আর তন্ময় ক্রমাগত বাপ্পাকে খেপিয়ে যাচ্ছে বাঁধনের অলক্ষ্যে। বাপ্পা মুখে দেখাচ্ছে খুব রেগে যাচ্ছে আসলে ভেতরে ভেতরে খুশিতে টগবগ করে ফুটছে।
ঋজু গম্ভীর হয়ে আছে। ভোরে বাঁধনের সঙ্গে তাকে চান্দ্রেয়ী দেখে ফেলার পর থেকে ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে। চান্দ্রেয়ী তাকে হোয়াটস অ্যাপ আর ফেসবুকে ব্লক করে দিয়েছে। অন্য সিম দিয়ে চান্দ্রেয়ীকে হোয়াটস অ্যাপে ঋজু জানিয়েছে পুরোটাই। কোন রিপ্লাই আসে নি।
সে পরোটা হাতে নিয়ে বসেছিল কিন্তু খাচ্ছিল না। বাপ্পা বলল "কী রে ভাই, মন খারাপ করছিস কেন? খেয়ে নে চাপ না নিয়ে সব ঠিক হয়ে যাবে"।
বাঁধন চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিল।
ঋজু অন্যমনস্কভাবে বলল "হু"।
শুভায়ু বলল "ড্রাইভার বলছে কাল ভোরে ভোরে মানালি না বেরিয়ে আজ রাতে বেরিয়ে গেলে কেমন হয়?"
তন্ময় বলল "ক্ষেপেছিস নাকি তুই? এই রাস্তায় রাতের বেলা? কোন দরকার নেই। কী বলিস ঋজু?"
ঋজু বলল "তোরা যা ভাল বুঝিস কর। আমার কোনটাতেই কোন আপত্তি নেই। যদি বলিস এখন বাড়ি ফিরে যাবি আমি তাতেও রাজি"।
বাঁধন খেতে খেতে একবার থমকে গেল। তারপর আবার খেতে শুরু করল।
বাপ্পা গম্ভীর গলায় বলল "দেখ ঋজু, অত চিন্তার কোন কারণ নেই, রিলেশন মানেই কখনও মন খারাপ কখনও মন ভাল। এত চাপ নেবার কিছু নেই"।
বাঁধনের খাওয়া হয়ে গেছিল। সে উঠে হাত ধুতে গেল।
শুভায়ু নিচু গলায় বলল "বাওয়া, একটু গো কার্ট করেই রিলেশনশিপ নিয়ে জ্ঞান দেওয়া শুরু করে দিয়েছিস?"
তন্ময় জোরে হেসে উঠল, বাপ্পা জ্বলন্ত চোখে শুভায়ুর দিকে তাকিয়ে বলল "আস্তে কথা বল, ও শুনতে পাবে"।
শুভায়ু বলল "দেখ ভাই, দিনে স্বপ্ন দেখছিস দেখ, কিন্তু বাড়াবাড়ি করিস না। মেয়েটাকে আমাদের সঙ্গে নিয়েছি ঠিক আছে, বেড়ানো হয়ে গেলে ও ওর মত যে চুলোয় যাবে যাক। তুই যেভাবে চাপ নিয়ে নিচ্ছিস, ফুল ফ্লেজে পেছন মারাবি তোকে আগে থেকেই বলে দিচ্ছি"।
বাপ্পা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঋজু বলল "এসব ক্যাচাল প্লিজ তোরা বাদ দে তো। আমার মাথা খারাপ হয়ে আছে। চান্দ্রেয়ী বাঁধনের ব্যাপারটা নিয়ে ভীষণ রেগে আছে, কী করতে হবে কিছুই বুঝতে পারছি না আমি"।
শুভায়ু বলল "ও ঠিক হয়ে যাবে, তুই আজ রাতে মানালি রওনা দিবি নাকি সেই ডিসিশনটা নে আগে। সিমলা থেকে মানালি কিন্তু অনেকটা রাস্তা"।
তন্ময় বলল "আমরা তো গাড়িটা ছেড়ে দিতে পারি, বাসে গেলেও হত। অনেক টাকার ধাক্কা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু"।

ঋজু বলল “তোদের তো বলেছি গাড়ির ব্যাপারটা আমি দেখছি। তোরা যা পারিস পরে আমায় দিয়ে দিস”।
তন্ময় বলল “তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু রাতে যাবার ব্যাপারে আমি আমার আপত্তি জানিয়ে রাখছি”।
শুভায়ু বাপ্পাকে বলল “তুই কী করবি?”
বাপ্পা বলল “বাঁধন আসুক, কী বলে দেখি”।
শুভায়ু বলল “কেন? বাঁধন তোর হাসব্যান্ড বোকাচোদা? ও কী বলে আবার কী? তুই কী বলিস সেটা আগে বল”।
বাপ্পা আমতা আমতা করছিল। বাঁধন এসে পড়েছিল। বাপ্পা যেন হালে পানি পেল, শুভায়ুকে অগ্রাহ্য করেই বাঁধনকে বলল “রাতে মানালির দিকে জার্নি করলে তোমার কোন আপত্তি আছে?”
বাঁধন একবার শুভায়ুর দিকে আরেকবার বাপ্পার দিকে তাকিয়ে বলল “আমি তো তোমাদের সঙ্গেই ঘুরছি। আমি আবার কী ওপিনিয়ন দেব? তোমরা যেভাবে ঘুরবে আমি সেভাবেই ঘুরব। আমার কোন কিছুতেই কোন প্রব্লেম নেই”।
বাপ্পা মাথা চুলকে বলল “তারমানে তো হ্যাঁ-ই হয়?”
শুভায়ু আগুনে চোখে বাপ্পার দিকে তাকিয়ে বলল “হ্যাঁ না না ক্লিয়ার করে বল”।
বাপ্পা মরিয়া হয়ে ঋজুর দিকে তাকাল “তুই কী বলিস? রাতে রওনা দিবি?”
ঋজু বলল “রাতে রওনার কন্সেপ্টটা কী? রাতে জার্নি করেও মানালিতে গিয়ে তো সেই ঘুমিয়েই কাটাতে হবে সকালটা! তার থেকে ভোরে গেলেই হয়!”
শুভায়ু বলল “ভোর মানে কিন্তু ভোরই, এই বাপ্পাটার ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম আছে, ভোরে চল্লিশবার বড় বাইরে যায়, ওর জন্য দেরী হয়ে গেলে ওকে রেখে চলে যাব”।
বাপ্পা রেগে গেল “দেখ শুভায়ু একদম ফালতু বকবি না তুই”।
তন্ময় বলল “কাল ভোরই ঠিক আছে। আজ আবার ম্যালে ঘুরব। ম্যালটা বেশ ভাল লাগে। কাল তো বাঁধন ম্যালে যাও নি, আজ যেও, ভাল লাগবে”।
সবারই খাওয়া হয়ে গেছিল ঋজু বাদে। ঋজু বলল “আমার খাবারটা প্যাক করে নে। আর খেতে ইচ্ছা করছে না”।
শুভায়ু বলল “দেবদাস হয়ে লাভ নেই ভাই বেড়াতে এসে, বিন্দাস ঘোর, পরে যা হবে দেখা যাবে”।
মিনিট দশেকের মধ্যে তারা গাড়িতে উঠলে গাড়ি স্টার্ট দিল। বাকি রাস্তাটা শুভায়ু আর তন্ময় বাপ্পার পেছনে লাগতে লাগতে গেল, ঋজু চুপ করে বসে থাকল।
হোটেলে পৌঁছে তন্ময়, শুভায়ু আর বাপ্পা তিনজনই কম্বলের তলায় ঢুকে গেল। ঋজু বেশ খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে রুম থেকে বেরিয়ে বাঁধনের রুমে বেল বাজাল।
বাঁধন দরজা খুলে তাকে দেখে বলল “কিছু বলবে?”
ঋজু বলল “আমার একটা হেল্প করতে পারবে?”
বাঁধন বলল “বল”।
ঋজু একটু ইতস্তত করে বলল “তুমি তো বুঝতেই পারছ আমার গার্লফ্রেন্ড সকালে আমাদের দেখে উলটোপালটা কিছু একটা ভেবে নিয়েছে। এবার তুমি যদি একটু ওকে বুঝিয়ে বলতে...”
বাঁধন কয়েক সেকেন্ড ঠোঁট কামড়ে কিছু একটা ভাবল। বলল “ভেতরে এসো”।
ঋজু বলল “না না, আর ভেতরে যাব না”।
বাঁধন বলল “এসো, জাত যাবে না, চরিত্রও ঠিকই থাকবে তোমার”।
ঋজু লজ্জিত হয়ে বলল “না না, সেরকম কিছুর জন্য না। আচ্ছা, আমি ভিতরে আসছি”।
বাঁধনের রুমে ঢুকে সোফায় বসল ঋজু।
বাঁধন বলল “দেখো আমি তোমার গার্লফ্রেন্ডকে বলতেই পারি, কথা সেটা নয়, কথা হল ব্যাপারটার হিতে

বিপরীত হবারও একটা চান্স আছে। মানে আমি নিজেকে ওর জায়গায় রাখলে বুঝতে পারছি ওর জায়গা থেকে ও একশ শতাংশ ঠিক। আমার মনে হয় তোমার ওকে একটু সময় দেওয়া উচিত। ও ঠিকই বুঝে যাবে পুরো ব্যাপারটা"।
ঋজু অধৈর্যের মত মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল "তুমি ওর বাবাকে চেনো না। ওকেও না। এমনিতেই ওর বাবা জেনে গেছেন, ওর ব্রেন ওয়াশিং শুরুও হয়ে গেছে নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধে। এখন সকালের ঘটনাটা পুরো ব্যাপারটাকেই আরও কমপ্লিকেটেড করে তুলবে"।
বাঁধন বলল "হ্যাঁ কিন্তু আমি বললে সমস্যাটা কমবে কি?"
ঋজু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় রুমের কলিং বেল বেজে উঠল। বাঁধন দরজা খুলে দেখল বাপ্পা দাঁড়িয়ে আছে। বাপ্পার মুখ সন্দিগ্ধ। গলা বাড়িয়ে রুমের ভিতরে ঋজুকে দেখে বলল "কী করছিস ভাই?"
বাঁধন বলল "কথা আছে কিছু। তোমার কিছু দরকার?"
বাপ্পা বলল "ভিতরে আসতে পারি?"
বাঁধন দরজা ছেড়ে দাঁড়াল "এসো"।
বাপ্পা তড়িঘড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকে ঋজুর পাশে বসে পড়ল। ঋজু বিরক্ত মুখে বাপ্পার দিকে তাকাল।
বাপ্পা বলল "কী ভাই, কী ব্যাপার জানতে পারি?"
ঋজু বলল "না"।
বাপ্পা খানিকটা নিভে গেল। পরের মুহূর্তেই প্রবল উৎসাহে বাঁধনকে বলল "আচ্ছা, আমি যদি ঈদে তোমাদের বাড়ি যাই আমায় কী কী খাওয়াবে?"

২৭

হোটেলে ফিরতে সাড়ে তিনটে বেজে গেল। চান্দ্রেয়ী সারাদিন কিছু খায় নি। গম্ভীর হয়ে আছে। সৌরেন কিচ্ছু বলেন নি। মালিনী ঘ্যান ঘ্যান করে চলেছেন "কী হয়েছে বল তো? খাচ্ছিস না কেন?"
চান্দ্রেয়ী বলেছে শরীর খারাপ। মালিনী অনেক প্রশ্ন করেও উত্তর পান নি। কুফরিতে চান্দ্রেয়ী গাড়ি থেকেই নামে নি। বসে ছিল। মালিনীও নামেন নি। সৌরেন বিরক্ত হয়ে একাই ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে এসেছেন।
সৌরেন বুঝতে পারছিলেন ছেলেটির সঙ্গে মামণের কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। কিন্তু নিজে জিজ্ঞেস করছিলেন না। রুমে ঢুকে চান্দ্রেয়ী শুয়ে পড়ল।
সৌরেন ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। মালিনী এলেন খানিকক্ষণ পরে।
মালিনী বললেন "কী হল বলত? ডাক্তার দেখাবে? জ্বর টর তো নেই দেখলাম"।
সৌরেন বললেন "দেখো সন্ধ্যে অবধি"।
মালিনী বললেন "কী যে হয় মাঝে মাঝে মেয়েটার?"
সৌরেন বললেন "তুমি বুঝতে পারো না তোমার মেয়ের কী হয় মাঝে মাঝে?"
মালিনী চেয়ারে বসলেন, ক্লান্ত গলায় বললেন "নিজেকে নিয়েই পেরে উঠি না, ওর দিকে আর কখন দেখব বল। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমি না থাকলেও তোমার আর মামণের কিছু যায় আসত না"।
সৌরেন মালিনীর দিকে তাকালেন। হেরে যাওয়া, বিপর্যস্ত একটা মুখ। মালিনীর পাশের চেয়ারে বসলেন তিনি।
দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন।
মালিনী বললেন "কাল চলে যাব, না? দুদিনেই কেমন মায়া পড়ে গেল জায়গাটার ওপরে"।
সৌরেন বললেন "হ্যাঁ, আটটায় রওনা দেব। মানালি যেতে টাইম লাগবে একটু"।
মালিনী বললেন "কতক্ষণ লাগবে?"
সৌরেন বললেন "আট ন ঘন্টা ধরে নাও"।

মালিনী ভয়ার্ত গলায় বললেন "ওরে বাবা। অতক্ষণ জার্নি করাবে?"
সৌরেন বললেন "কী আর হবে? বসে থাকবে গাড়িতে। অভ্যাস হয়ে যাবে"।
মালিনী বললেন "প্রথম প্রথম যখন পাহাড়ে আসতাম, ভয়ে চোখ বন্ধ করে বসে থাকতাম। এখন ভয় লাগে না। কিন্তু বড় বিরক্ত লাগে বড় জার্নি হলে"।
সৌরেন বললেন "একটু জার্নিও দরকার বুঝলে তো? সর্বক্ষণ ঘরে বসে থাকাটাও তো কাজের কথা না"।
মালিনী বললেন "তা বটে। আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলবে?"
সৌরেন বললেন "বল"।
মালিনী বললেন "ট্রেন থেকে তুমি হঠাৎ করে অমন ক্ষেপে গেলে কেন? চন্ডীগড়ে নামিয়ে দিলে জোর করে। ওখানে গিয়ে ঠিক করতে পারছ না কী করবে, কোথায় যাবে, চূড়ান্ত ইনডিসিশনে ভোগা শুরু করলে, কী হয়েছিল কী তোমার?"
সৌরেন হাসলেন "নতুন দেখলে নাকি আমায় এরকম? সেবার দার্জিলিং যাবার সময় ভুলে গেলে? ঠিক করে গেলাম প্রথমে দার্জিলিং যাব, এন জেপি পৌঁছে একটা জিপে পেলিং লেখা দেখেই ঠিক করে ফেললাম দার্জিলিং না, আগে পেলিং চলে যাব। আমি তো এরকমই"।
মালিনী তাকালেন তার দিকে "এবারেও কি তাই? ঠিক তো?"
সৌরেন রাস্তা দেখছিলেন। ট্যুরিস্টরা দল বেঁধে ম্যালের দিকে যাওয়া শুরু করেছে। একটা উৎসব উৎসব পরিবেশ চারদিকে। মালিনীর প্রশ্নের উত্তরে বললেন "হ্যাঁ হ্যাঁ। একবারেই তাই। তোমার কি কষ্ট হয়েছে খুব?"
মালিনী বললেন "না না, অভ্যাস করে দিয়েছ তো। এখন আর কোন অসুবিধা হয় না। তবে ভোর রাতে পাগলামিটা না করলে দুপুরে করলে ভাল করতে"।
সৌরেন হাসলেন। কিছু বললেন না। চান্দ্রেয়ী হঠাৎ উঠে ব্যালকনিতে এসে বলল "হোটেলে কিছু পাওয়া যাবে এখন? খিদে পাচ্ছে"।
মালিনী ব্যস্ত হয়ে বললেন "দেখেছ, এখন মেয়ের খিদে পাচ্ছে! এবার কী হবে?"
সৌরেন চান্দ্রেয়ীর দিকে তাকালেন "চ আমার সঙ্গে"।
চান্দ্রেয়ী বলল "চল"।
মালিনী বললেন "তাই ভাল। আমি ব্যালকনিতেই বসছি। তুমি ওকে খাইয়ে নিয়ে এসো"।
সৌরেন চান্দ্রেয়ীকে নিয়ে বেরলেন। চান্দ্রেয়ী চুপ করে হেঁটে যাচ্ছিল কোন কথা বলছিল না। লিফটে উঠে বলল "তুমি কি কিছু জানতে চাও?"
সৌরেন বললেন "তুই বলতে চাইলে বলতে পারিস"।
চান্দ্রেয়ী চুপ করে গেল। কিছু বলল না।

২৮

সন্ধ্যে হয়েছে। ম্যালের পাশের বাজারে কেনাকাটা চলছে। বাপ্পা মোটামুটি বাঘের মত কিনছে। দুটো উইন্ডচিটার আর দুটো মাফলার কিনেছে। শুভায়ু তন্ময়কে বলল "হ্যাঁ রে, অত মোটা একটা কিটব্যাগে এত এত সোয়েটার এনেছে। এরপরে আবার এগুলো কিনছে কেন?"
তন্ময় বলল "কলকাতার গরমে ও সব পরে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে ট্রাফিক কন্ট্রোল করার প্ল্যান করছে আর কী!"
ঋজু বাজারে যায় নি। হোটেলেই থেকে গেছিল। বাঁধন তন্ময় আর শুভায়ুর সঙ্গে বেরিয়ে ম্যালে বসার জায়গায় বসেছে। বাকি তিনজন বাজারে গেছে।
বাপ্পা বলল "হ্যাঁ রে, বাঁধনের জন্য কী নেওয়া যায়?"

তন্ময় বলল “তোর যা ধান্দা দেখছি কন্ডোম নিয়ে নে আর কী”!
বাপ্পা আহত চোখে তন্ময়ের দিকে তাকাল “বোকাচো! আমি কি ওকে ঐ চোখে দেখি?”
শুভায়ু বলল “তবে কোন চোখে দেখিস ভাই? পরের ভাই ফোঁটায় ফোঁটা নিবি?”
বাপ্পা খুক খুক করে কেশে বলল “ফোঁটা নেব তা বলি নি কিন্তু আমার এই মুহূর্তে কন্ডোম ইউজ করারও কোন রকম প্ল্যান নেই”।
তন্ময় বলল “ও, উত্তম সুচিত্রা টাইপ প্রেম করার ইচ্ছা আর কী! বিয়ের আগে গুজব না, আহা, কী প্লেটোনিক লাভ মামা”!
শুভায়ু বলল “বিয়ে করবে? ওর বাপ ওকে আগা পাস্তালা বাটার জুতো দিয়ে জুতোবে অন্য ধর্মের মেয়ে বিয়ে করলে”।
বাপ্পা উদাস গলায় বলল “বীর জারা দেখেছিস?”
তন্ময় বলল “হ্যাঁ, ওটা শাহরুখ খান, আর তুই হিরো লোম। জীবনে আশা করেছিস এই অনেক”।
বাপ্পা বলল “এই মেয়েটা একা একা বসে আছে, ওর জন্য ক্রিম রোল নিয়ে যাই দাঁড়া”।
শুভায়ু বলল “দেখিস আবার নিজের ক্রিম রোলটাই খাওয়াতে যাস না, একটা ক্যালও মাটিতে পড়বে না ভাই আগে ভাগে বলে দিলাম”।
বাপ্পা ওদের দুজনের দিকে কটমট করে তাকিয়ে গটগট করে হেঁটে একটা বেকারি শপ থেকে দুটো ক্রিম রোল কিনে ম্যালের দিকে এগোল। শুভায়ু আর তন্ময় একটা দোকানে মোমো খেতে বসল। মিনিট দশেক বাদে বাপ্পা হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল “গাঁড় মেরেছে ভাই”।
শুভায়ু বলল “কী হয়েছে”?
বাপ্পা বলল “বাঁধন নেই। গোটা ম্যাল তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। নেই”।
শুভায়ু বলল “ভাল তো। পালিয়েছে ছেলেটার মত”।
তন্ময় নড়ে চড়ে বসল “না রে, ব্যাপারটা এত হাল্কাভাবে নিস না, মেয়েটা পালালে আমাদের গাড়ে হাম্পু হয়ে যাবে সেটা বুঝতে পারছিস না? আমাদের সঙ্গেই তো চেক ইন করেছে। পুলিশ কেস হয়ে যাবে”।
শুভায়ু ঘাবড়ে গেল প্রথমে, তারপর রেগে মেগে বলল “এই জন্য বলি বাঁড়া, উটকো ঝামেলা গায়ে নিলে এইরকমই হয়। নে এবার কী করবি ঠিক কর!”
তন্ময় বলল “ফোন কর মেয়েটাকে”।
বাপ্পা শীতের মধ্যেও ঘামছিল “ফোন লাগছে না তো”।
তন্ময় বলল “আছে হয়ত ধারে কাছেই, বাথরুমেও যেতে পারে। ঘন্টাখানেক দেখ, মোমো খা, তারপরে দেখা যাবে”।
বাপ্পা বলল “হোটেলে ফিরে যায় নি তো?”
তন্ময় বলল “ঋজুকে ফোন কর”।
শুভায়ু ফোন বের করে ঋজুকে ফোন করল। ফোন অফ।
শুভায়ু বলল “নে, আশিকচোদা সকাল থেকেই ঝাঁট জ্বালিয়ে রেখে দিয়েছে। নিশ্চয়ই ঝগড়া করে ফোন অফ করে রেখে দিয়েছে”।
বাপ্পা বলল “কী করবি তাহলে”?
শুভায়ু বলল “কী আর করবি? মোমো খেয়ে ম্যালে গিয়ে বসি চ, ঘন্টাখানেক দেখে হোটেলে ফিরে যাব”।
তন্ময় বলল “নইলে আমাদেরই পুলিশে মিসিং ডায়েরী করতে হবে”।
শুভায়ু বলল “বাঁড়া ঘুরতে এসে এত ঝামেলা ভাল লাগে না বাল। কোত্থেকে এই বাপ্পা বালটা একটা জোটাল। বোকাচোদা ফ্রাস্ট্রুচোদার বাল একটা, গোটা জীবনে একটা মেয়ে তুলতে পারে নি, এখন মামণিবাজি করতে গিয়ে দেখ কেমন লাগে। শোন ভাই, যদি কোন ঝাম হয় আমি শুরু থেকেই বলে দেব তুই চিনিস।

আমরা কেউ কিছু চিনি না"।
বাপ্পা গম্ভীর হয়ে বসে ঘামতে লাগল।
#
ঋজু হোটেলের ঘরে ছিল। আগের দিনের বোতলে বেশ খানিকটা মদ পড়ে ছিল। সে একটা গ্লাস নিয়ে একা একা খাচ্ছিল। চান্দ্রেয়ীর ফোন অনেকবার চেষ্টা করেছে দুপুর থেকে। ফোন অফ করে রেখেছে চান্দ্রেয়ী। ঋজুর মাথা কাজ করছিল না। কী করবে বুঝতে না পেরে সেও ফোন অফ করে দিয়েছে।
তিন পেগ খেয়ে ঠান্ডা মেঝেতে বসে টিভি দেখছিল সে, কলিং বেল বাজল।
দরজা খুলে দেখল বাঁধন দাঁড়িয়ে আছে।
ঋজু বলল "তুমি ম্যালে গেছিলে না? ওরা চলে এসেছে?"
বাঁধন বলল "ধুস, বোর লাগছিল, চলে এলাম"।
ঋজু বলল "ওহ"।
বাঁধন বলল "তুমি কী করছ?"
ঋজু বলল "গিলছি"।
বাঁধন বলল "কাল তো খেলে না"।
ঋজু ঘরে ঢুকে বলল "কাল তো ঝামেলা হয় নি, আজ হয়েছে, কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না"।
বাঁধন বলল "দাঁড়াও আমিও একটা গ্লাস নি"।
বাঁধন নিজেই একটা গ্লাস নিয়ে পেগ বানিয়ে নিল। ঋজু বলল "ওদের বলে এসেছ তো?"
বাঁধন কাঁধ ঝাঁকাল "ওরা তো মার্কেট ঘুরছিল। বুঝে যাবে নিশ্চয়ই। একী তুমি মেঝে তে বসছ কেন?"
ঋজু বলল "ঠান্ডাটাই ভাল লাগছে। কলকাতা গেলে তো আবার সেই গরমে থাকতে হবে। যতটা পারি ঠান্ডাটা বডিতে নিয়ে নি"।
বাঁধন গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে বলল "ভাল বলেছ। আমাদের দুর্গাপুর বাঁকুড়া সাইড তো আসো নি, ভাবতেও পারবে না গরমকালে ওখানে ঠিক কী লেভেল গরম পড়ে। দাঁড়াও, আমিও মেঝেতেই বসি"।
বাঁধন ঋজুর পাশে বসে পড়ল। খাটের ওপরে শুভায়ুর সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার রাখা। বাঁধন একটা সিগারেট নিল। ঋজুকে বলল "তুমি নেবে?"
ঋজু বলল "কাউন্টার দিও"।
বাঁধন খানিকটা টেনে ঋজুকে দিল। দুজনে মিলে বেশ কয়েক পেগ মদ খেয়ে ফেলল।
বাঁধন জড়ানো গলায় বলল "এই ভাল না? সব কেমন ভুলে থাকা যায়?"
ঋজু ঠিক করে বসে থাকতে পারছিল না। সে শুয়ে পড়তে গেল, ঠিক মত মেঝেতে শুতে না পেরে বাঁধনের কোলেই মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। বাঁধন বাধা দিল না। বলল "তোমার বন্ধুরা দেখতে পেলে ভুল বুঝবে ঋজু"।
ঋজু রেগে গেল, "সবাই ভুলই বুঝুক, একজনকে ভালবাসি, সে ভুল বুঝবে, বন্ধুরা ভুল বুঝবে, বুঝলে বুঝবে আমি কী করব?"
বাঁধন বলল "তোমার খুব নেশা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে"।
ঋজু কয়েক সেকেন্ড চুপ চাপ শুয়ে থেকে উঠে বসে বাঁধনকে জড়িয়ে ধরে বাঁধনের ঠোঁটে চুমু খেতে গেল। বাঁধন সঙ্গে সঙ্গে ঋজুকে আটকাল "কী করছ? মাথা খারাপ হয়ে গেছে?"
ঋজু বাঁধনের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর "ছি ছি ছি, আমি কী করছিলাম!" বলে উঠে সোয়েটার পরে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।
বাঁধন বাধা দিল না। সে রুমেই বসে রইল চুপ করে।

২৯

সৌরেন হোটেলে ছিলেন। কুফরিতে ঘোড়ায় চড়ে কোমরে সামান্য ব্যথা করছিল। অভ্যাস নেই। এতদিন পরে চড়ে অস্বস্তি হচ্ছিল।

চান্দ্রেয়ী খেয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আরামদায়ক আবহাওয়া। মালিনী টিভিতে সিরিয়াল দেখছিলেন।

সৌরেন বললেন "কিছু স্ন্যাক্স খাবে নাকি?"

মালিনী বললেন "কালকে পকোড়া ভালই খেয়েছিলাম। আজ কী খাওয়া যায়?"

সৌরেন বললেন "তোমার তো আবার সব খাবার ঘরে আনা যাবে না, তুমিই বল"।

মালিনী বললেন "এই ওয়েদারে তো পেঁয়াজি খেতে ইচ্ছা করে, সে কি আর এখানে পাওয়া যাবে?"

সৌরেন বললেন "ফ্রেঞ্চফ্রাই খাবে?"

মালিনী ঠোঁট বাঁকিয়ে বললেন "আলুভাজা?"

সৌরেন বললেন "হ্যাঁ। ভালই তো লাগে। কফি আর আলুভাজা বলে দি"।

মালিনী বললেন "আচ্ছা তাই কর"।

সৌরেন রুম সার্ভিসে ফোন করে অর্ডার দিয়ে দিলেন।

মালিনী বললেন "খিদে পায় শুধু বল পাহাড়ে এলে? কলকাতায় থাকলে তো শুধু অম্বল আর অম্বল"।

সৌরেন বললেন "এখানেই থেকে যাই চল"।

মালিনী হাসলেন "মন্দ হয় না"।

সৌরেন বললেন "এখন বুঝতে পারছ না, শীতকালে এখানে মারাত্মক শীত পড়ে"।

মালিনী বললেন "বরফ পড়ে?"

সৌরেন বললেন "পড়ে তো, কাগজে দেখো না সিমলায় বরফ পড়েছে?"

মালিনী বললেন "ফায়ার প্লেসের পাশে বসে থাকব আর কী। আর কী হবে?"

কলিং বেল বেজে উঠল। মালিনী বললেন "ওই দেখো, এসে গেছে আমাদের অর্ডার। হোটেলটা সত্যি ভাল, কত তাড়াতাড়ি সারভ করছে দেখো"।

সৌরেন উঠলেন "তাই দেখছি"।

সৌরেন দরজা খুললেন। দেখলেন একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। শ্যামলা চেহারা, চেহারার মধ্যে একটা মিষ্টত্ব আছে। সৌরেন বললেন "কী চাই?"

ছেলেটা বেশ কঠিন গলায় বলল "চান্দ্রেয়ী আছে?"

সৌরেন অবাক চোখে ছেলেটার দিকে তাকালেন। একটা মৃদু অ্যালকোহলের গন্ধ ভেসে আসছে। বুঝতে পারলেন ছেলেটা মদ খেয়ে এসেছে। মালিনী জিজ্ঞাসু গলায় ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করলেন "কে গো"?

সৌরেন বললেন "কেউ না"।

সৌরেন দরজা বন্ধ করে বাইরে এলেন "তোমার নাম কী?"

ছেলেটা বলল "ঋজু"।

সৌরেন ঋজুর কাঁধে হাত রাখলেন "তুমি এখন সুস্থ অবস্থায় নেই ঋজু, চল তোমায় হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি"।

ঋজু সৌরেনের দিকে তাকাল, "আপনি চান্দ্রেয়ীর বাবা?"

সৌরেন বললেন "হ্যাঁ"।

ঋজু বলল "আপনি খুব রাগী না?"

সৌরেন ঋজুকে নিয়ে লিফটের দিকে এগোতে এগোতে বললেন "রাগী তো বটেই। মেয়ের বাবাদের রাগী হতে হয় জানো না?"

ঋজু বলল "মেয়ের বাবাদের রাগী হতে হয় ঠিক আছে, তা বলে কি মেয়েদেরও রাগী হতে হবে?"

তারা লিফটের কাছে এসে গেছিলেন।
সৌরেন ঋজুকে নিয়ে লিফটে ঢুকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে যাবার সুইচ টিপলেন। ঋজু বলল "একী আপনি আমাকে চান্দ্রেয়ীর সঙ্গে দেখা করতে দেবেন না?"
সৌরেন বললেন "দেব, কিন্তু শোন, চান্দ্রেয়ীর মা নার্ভের রুগী, শুধু নার্ভই বলি কেন, অনেক কিছুরই রুগী, এখন তুমি যে পরিস্থিতিতে আছো, তাতে যদি ওঁর সামনে যাও তাহলে এই রাত্তিরে আমায় হসপিটাল খুঁজতে হবে, তুমি কি সেটা চাও?"
ঋজু চিন্তিত মুখে সৌরেনের দিকে তাকিয়ে বলল "নাহ, সেটা তো খুব বাজে ব্যাপার হয়ে যাবে। তাহলে এখন যাব না, কিন্তু চান্দ্রেয়ী যে আমার ফোন ধরছে না, আমার সঙ্গে কথা বলছে না, এ সবের কী হবে বলুন তো আংকেল?"
গ্রাউন্ড ফ্লোর এসে গেছিল। সৌরেন ঋজুর কাঁধে হাত রেখে বেরোলেন "কিছুই হবে না, রিলেশনশিপে এসব প্রায়ই হয়। তুমি এখন হোটেলে যাও, হোটেলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়। পরে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে"।
ঋজু মাথা নাড়তে নাড়তে বলল "কিছুই ঠিক হবে না আঙ্কেল। আপনিও তো চান না আমাদের রিলেশনটা থাকুন। ট্রেন থেকে জোর করে চন্ডীগড়ে নেমে গেলেন, পারলে তো পাকিস্তানে চলে যেতেন যা শুরু করেছিলেন চন্ডীগড়ে, এর পরেও কী করে এক্সপেক্ট করব সব ঠিক হয়ে যাবে?"
সৌরেনের সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছিল। একটা দোকান থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে বললেন "কোন মেয়ের বাবা মেয়ের প্রেমিককে প্রথম দর্শনে মেনে নেবে বলে তোমার মনে হয়?"
ঋজু সৌরেনের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল "কাউন্টার দেবেন তো আঙ্কেল। মাথাটা গেছে আমার"।
সৌরেন হেসে ফেললেন "ক'পেগ খেয়েছ?"
ঋজু বলল "কে জানে? সাত আট হবে। বেশিও হতে পারে। চান্দ্রেয়ী দিব্যি দিয়েছিল বলে কালকে খাই নি। আমি খেলে উলটো পালটা কাজ করে ফেলি বলে দিব্যি দিয়েছিল। মনে হচ্ছে কিছু একটা করে ফেলেছি এর মধ্যেই"।
সৌরেন সিগারেটে টান দিয়ে সিগারেটটা ঋজুকে দিয়ে বললেন "তা করেছো। চল তোমাকে হোটেলে দিয়ে আসি"।

৩০

বাপ্পারা হোটেলে ফিরে দেখল তাদের রুমের দরজা খোলা। বাঁধন একা একা বসে মদ খাচ্ছে।
শুভায়ুর মাথা গরম ছিল, বাপ্পাকে বলল "তুই কথা বলবি না আমি বলব?"
বাপ্পা বলল "আমি বলছি। বাঁধন"!
বাঁধন বাপ্পার দিকে তাকাল। সে অনেকটা মদ খেয়ে ফেলেছে এর মধ্যে। ঠান্ডা গলায় বলল "বল"।
বাপ্পা বলল "তুমি আমাদের বলে আসবে না?"
বাঁধন জড়ানো গলায় বলল "তোমাদের তো খুঁজেই পেলাম না। বোর লাগছিল। চলে এলাম"।
বাপ্পা অধৈর্য হল "ফোন করবে না একবার? তোমার ফোনও তো পাচ্ছিলাম না!"
শুভায়ু তন্ময়কে বলল "চ ঘুরে আসি কিছুক্ষণ। এখানে থাকলে খিস্তি বেরিয়ে যাবে"।
তন্ময় বলল "দাঁড়া না। মাথা ঠান্ডা কর। হারায় তো নি। এখানেই তো আছে মেয়েটা"।
বাঁধন বলল "আমার ফোনে আসলে চার্জ ছিল না। চার্জে বসিয়েই বেরিয়েছিলাম। আমি সরি, প্লিজ কিছু মনে কোর না"।
বাঁধন ঠোঁট ফোলাল। বাপ্পা শুভায়ুকে ফিসফিস করে বলল "এই রকম মুখ করলে কোন বানচোদ ওর ওপর রাগ করে থাকবে বল? আমি এই মেয়ের জন্য পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে দেব ভাই"।
শুভায়ু বলল "নে, শুরু হয়ে গেল নাটকবাজি"।

তন্ময় একটা গ্লাস নিয়ে বোতল থেকে মদ নিয়ে বসে গেল।
বাঁধন বলল "সিগারেট আছে? প্যাকেটের যে ক'টা ছিল খেয়ে ফেলেছি।"
শুভায়ু পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে বাঁধনের দিকে ছুঁড়ে মারল। বাপ্পা বলল "ঋজু কোথায়?"
বাঁধন কাঁধ ঝাঁকাল "জানি না"।
শুভায়ু অবাক চোখে তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলল "নে ল্যাওড়া, একজনকে পাওয়া যায় তো আরেকজন হারিয়ে যায়। কোথায় গেল মালটা এই রাতে?"
তন্ময় বলল "চান্দ্রেয়ীর কাছে যেতে পারে"।
শুভায়ু বলল "অ। তা সে কি এত রাতে দেখা করবে নাকি?"
বাঁধন বলল "ঋজু চান্দ্রেয়ীকে খুব ভালোবাসে?"
বাপ্পা বলল "খুব মানে? খুব বললে কম বলা হয়। নইলে কেউ এত দূর চলে আসে?"
বাঁধন বলল "সে তো পাহারা দেওয়াও হতে পারে, ভালোবাসাই হবে কেন সব সময়ে?"
বাপ্পা বলল "ও তোমাকে বুঝিয়ে বলা যাবে না"।
বাঁধন অন্যমনস্ক হল "তা ঠিক। ভালোবাসা আমি আজকাল বুঝতে পারি না। আমার এক্তিয়ারেই পড়ে না হয়ত। যার ভালোবাসার মানুষ পালিয়ে যায় সে কী করে ভালোবাসা বুঝবে? তুমি ঠিকই বলেছ"।
বাপ্পা দাঁত টাত বের করে বলল "আরে আমি কি অত কিছু বলতে চেয়েছি নাকি? তুমি আবার ভুল বুঝলে আমাকে"।
তন্ময় আর শুভায়ু মদ খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। বাপ্পা বলল "তুমি এক কাজ কর, তুমি বরং ঘরে যাও"।
বাঁধন সিগারেট ধরাল। বাপ্পার কথার উত্তর না দিয়ে বলল "ভালোবাসাটা আসলে সবার জন্য না জানো তো! সবার কপালে থাকেও না। কেউ তার সব কিছু দিয়ে ভালোবেসে ফেলল। পরে দেখা গেল সবটাই আসলে ভুয়ো। ওই যে দেখো না ভুয়ো ডাক্তার ধরা পড়ছিল ক'দিন আগে, ভালোবাসাটাও আসলে সেরকমই। প্রতিটা কাপলে যদি টেস্ট করে দেখা যায়, দেখা যাবে কেউ না কেউ ঠিক ভুয়ো বেরিয়েছে। তখন কী করা উচিত বল? জেল হওয়া উচিত না বল?"
বাপ্পা মুগ্ধ গলায় শুভায়ু আর তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলল "মেয়ের বুদ্ধি দেখেছিস ভাই? পুরো বুদ্ধিজীবি মেয়ে"।
শুভায়ু ফিসফিস করে বলল "বুদ্ধিজীবি গাড়ে গুজে বসে থাক বোকাচোদা"।
বাঁধন জোরে জোরে মাথা নাড়ল "আমার বুদ্ধি? আমার কোন বুদ্ধি নেই। আমি বোকা। সত্যিকারের বোকা। নইলে আজ এখানে আমি থাকি?"
কলিং বেল বেজে উঠল। বাপ্পা বলল "ঋজু এসেছে বোধ হয়। দেখ না তন্ময়"।
তন্ময় বলল "কোন লাটসাহেবের নাতজামাই তুমি বানচোদ? নিজে গিয়ে দেখো"।
বাঁধন হাত তুলল, "না না, আমিই দেখছি। দাঁড়াও"।
বাপ্পা বাঁধনকে বাঁধা দিতে যাচ্ছিল। বাঁধন তড়িঘড়ি উঠে জোর পায়ে হেঁটে দরজার কাছে পৌছে দরজা খুলল। ঋজু আর সৌরেন দাঁড়িয়ে আছে দরজার ওপাশে। ঋজু সৌরেনকে বলল "এই যে, এ হল বাঁধন"।
সৌরেন অবাক গলায় বাঁধনের দিকে তাকিয়ে বলল "ওহ। আচ্ছা আচ্ছা।"
ঋজু বলল "ভিতরে আসুন না, কেসটা আপনাকে বোঝাচ্ছি"। সৌরেন ইতস্তত করে রুমের ভিতরে ঢুকলেন। শুভায়ু, তন্ময়রা তাড়াতাড়ি গ্লাস লুকিয়ে ফেলল। তবে মেঝেতে বোতলটা ঠিকই ছিল।
বাপ্পা বলল "উনি কে রে ঋজু"?
ঋজু বলল "উনি চান্দ্রেয়ীর বাবা"।
শুভায়ু তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলতে গেল "গাঁড় মেরেছে", শব্দটা জোরে হয়ে গেল।

ঋজু ওদের দিকে তর্জনী দিয়ে ইশারায় চুপ দেখিয়ে সৌরেনের দিকে তাকিয়ে বলল "আঙ্কেল, প্লিজ বসুন"।
সৌরেন একটা চেয়ার টেনে বসলেন "আচ্ছা বসলাম। বল এবার তুমি কী বলবে"।
ঋজু হাত পা নেড়ে বলতে শুরু করল "দেখুন আঙ্কেল, আমরা চারজন, মানে এই হলাম আমি, ঐ যে ওর নাম বাপ্পা, ও শুভায়ু আর ও তন্ময়, এই চারজন বেড়াতে এসছিলাম। এবার রাস্তায় বাঁধন বাড়ি থেকে পালিয়েছে। মানে বুঝতে পারছেন তো? আমাদের সঙ্গে না কিন্তু, একটা ছেলের সঙ্গে, বাড়ি থেকে পালিয়েছে। এবার ট্রেন থেকে সেই ছেলেটা আবার ওকে ছেড়ে পালিয়েছে। বাঁধন কোথায় যাবে? আমাদের সঙ্গেই চলে এসেছে। আর চান্দ্রেয়ী ভেবেছে এর সঙ্গে আমার কিছু চলছে, ব্যস! আগুন লেগে গেছে!"
সৌরেন বললেন "এই গল্পটা তো গত আধঘন্টা ধরে গোটা দশেক বার শুনে ফেললাম। তোমার আর কিছু বলার নেই?"
ঋজু মেঝেতে বসে পড়ে বলল "চান্দ্রেয়ীকে আমি খুব ভালবাসি আঙ্কেল, ও আমাকে ছেড়ে দিলে আমি পাগল হয়ে যাব"।
সৌরেন বললেন "সেটাও তো একশ বার মত শুনলাম"।
বাপ্পা বলল "মানে কিছু মনে করবেন না, ঋজু কি আপনাদের হোটেলেই চলে গেছিল?"
সৌরেন বললেন "ওহ তোমাকে সোবার লাগছে, তুমি মদ খাও নি তার মানে?"
বাপ্পা বলল "না না, এই তো এলাম"।
ঋজু বলল "আচ্ছা আঙ্কেল, আপনি আবার একা একা হোটেল ফিরবেন এত রাতে? সেটাও তো ঠিক হবে না। চলুন আপনাকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসি"।
সৌরেন বললেন "তুমি ব্যস্ত হোয়ো না"।
প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালেন সৌরেন। শুভায়ু আর তন্ময় এতক্ষণ ইতস্তত করছিল। দুজনেই "একটু আসছি" বলে বেরিয়ে গেল। বাপ্পা বাঁধনকে বলল "চল তোমাকে তোমার রুমে ছেড়ে আসি"।
বাঁধন বাধা দিল না। বাপ্পার সঙ্গে বেরিয়ে গেল।
ঋজু মেঝেতে বসেছিল।
সৌরেনের ফোন বাজছিল। সৌরেন দেখলেন তনয়া ফোন করছেন। ধরলেন "বল"।
তনয়া বললেন "কোথায়?"
সৌরেন বললেন "এই একটু বেরিয়েছি"।
তনয়া বললেন "ওহ, তোমার মেয়ের প্রেমের খবর কী? ছেলেটা সীনে এন্ট্রি নিয়েছে?"
সৌরেন হো হো করে হাসতে শুরু করলেন।
তনয়া অবাক হয়ে ওপাশ থেকে হ্যালো হ্যালো করতে লাগলেন।

৩১

চান্দ্রেয়ী ঘুমাচ্ছিল। রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ উঠল। মালিনী টিভি দেখছিলেন।
চান্দ্রেয়ী ঘুম জড়ানো গলায় বলল "বাবা কোথায় গেল?"
মালিনী বললেন "এই তো বেরোল আবার। তোর বাবা কি ঘরে থাকার লোক? এলাকা চক্কর দিতে বেরিয়েছে আবার হয়ত"।
চান্দ্রেয়ী বলল "ফোন কর না। কাল তো আবার সেই মানালি বেরোতে হবে"।
মালিনী বললেন "আচ্ছা দাঁড়া"।
মালিনী সৌরেনকে ফোন করলেন, সৌরেন ধরলেন "বল"।
মালিনী বললেন "কোথায় তুমি?"

সৌরেন বললেন "এই তো ঘুরছি"।
মালিনী বললেন "চলে এসো। মামণ ঘুম থেকে উঠে পড়েছে তো। ডিনার করবে না?"
সৌরেন বললেন "আসছি। তোমরা ডাইনিং স্পেসে গিয়ে অর্ডার কর, আমি যাচ্ছি"।
চান্দ্রেয়ী গোঁজ হয়ে উঠে বসল। সারাদিন ঋজু অনেকবার ট্রাই করেছে। তার মাথায় রাগ চড়ে ছিল গোটা দিন ধরে। এখন খানিকটা রাগ নেমেছে। সে ফোনটা বের করে ঋজুকে ফোন করল। ফোন সুইচড অফ বলছে। চান্দ্রেয়ীর আবার রাগটা ফিরে এল। সুইচ অফ করার কী আছে? এমনিতে কলকাতায় থাকলে রাগারাগি হলে তো একবার ফোন করলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন ধরে নিত।
চান্দ্রেয়ী হোয়াটস অ্যাপে পাঠানো ঋজুর মেসেজগুলো দেখল। অন্য নাম্বার থেকে পাঠিয়েছে। ঋজু জানিয়েছে বাঁধন নামে মেয়েটার বয়ফ্রেন্ড মেয়েটাকে নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। মাঝরাস্তায় বাঁধনকে ফেলে পালিয়েছে।
ঋজু যে নাম্বার থেকে হোয়াটস অ্যাপ করেছিল, চান্দ্রেয়ী সে নাম্বারেও ফোন করল। সেটাও সুইচড অফ বলছে। চান্দ্রেয়ী ভাল করে মোবাইলে কনট্যাক্ট লিস্ট খুঁজল। ঋজুর বন্ধু বাপ্পার নাম্বার তার কাছে আছে মনে পড়ল। সে ব্যালকনির দরজা খুলল। মালিনী বললেন "কীরে মামণ, এই শীতে ব্যালকনিতে যাবি নাকি?"
চান্দ্রেয়ী বলল "একটা ফোন করে চলে আসছি চিন্তা কোর না"।
মালিনী আর কিছু বললেন না।
চান্দ্রেয়ী ব্যালকনিতে গিয়ে বাপ্পাকে ফোন করল। বাপ্পার ফোন দুবার রিং হতেই বাপ্পা ধরল "হ্যালো"।
চান্দ্রেয়ী বলল "আমি চান্দ্রেয়ী বলছি, ঋজুকে দাও তো"।
ওপাশে কয়েক সেকেন্ড নীরবতা, তারপর বাপ্পার গলা ভেসে এল "আর ঋজু, এখানে তো কেলেংকারির একশেষ হয়ে গেল"।
চান্দ্রেয়ীর বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। সে বলল "কেন? কী হয়েছে?"
বাপ্পা বলল "তোমার বাবা এসছিলেন জানো না? ঋজু তো তোমাদের হোটেলে চলে গেছিল। তোমার বাবাকে নিয়ে সোজা এই হোটেলে"।
চান্দ্রেয়ীর মাথা ঘুরে উঠল হঠাৎ করে। বলল "বাবা এখন কোথায়?"
বাপ্পা বলল "এই তো বেরিয়ে গেলেন এক্ষুণি"।
চান্দ্রেয়ী বলল "আর ঋজু?"
বাপ্পা বলল "ঋজু? সে তো পারলে শ্বশুরমশাইকে আবার হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসে। অনেক কষ্টে আটকে রাখা গেছে। সে মদ খেয়ে এক্কেবারে পেট্রোল ট্যাংকার হয়ে আছে"।
চান্দ্রেয়ী কঠিন গলায় বলল "ফোন দাও ওকে"।
বাপ্পা বলল "ধর একটু"।
ওপাশ থেকে বাপ্পার গলা শোনা গেল "এ ঋজু, নে নে, চান্দ্রেয়ী ফোন করছে"।
ঋজু বলল "দে দে"।
ঋজু ফোন কানে লাগাল "বল"।
চান্দ্রেয়ীর মাথা আগুন হয়েছিল, সে বলল "এটা তুমি কী করলে? সব শেষ করে দিলে?"
ঋজু একটু টাল খাওয়া গলায় বলল "আমি শেষ করে দিয়েছি? আমি? না তুমি? আমাকে ভালোবাসো যখন আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে না তুমি? একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলা মানেই আমি মেয়েটাকে লাগাচ্ছি? এই তো তোমার মেন্টালিটি"।
চান্দ্রেয়ী বলল "তুমি মদ খেয়েছ কেন? তোমাকে না আমি মদ খেতে বারণ করেছিলাম। কত দিব্যি দিয়েছিলাম!"
ঋজু বলল "দিব্যির ভাই হয়েছে। তুমি আমাকে ছেড়ে দিলে আমি তো সারাদিন মদ খাব। শোন, তোমার

বাবা লোকটা বেশ ভাল, শ্বশুর জামাই মিলে কাউন্টারে সিগারেট খেয়েছি, তোমার বাবাকে এক পেগ বিপিও খাইয়ে দিয়েছি, তুমি চাপ নিও না"।
চান্দ্রেয়ীর নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না, সে কোন মতে আর্তনাদ করে উঠল "মানে?"
ঋজু বলল "মানে আবার কী? শ্বশুরমশাই এক্কেবারে আমার দলের লোক বুঝলে? তোমাকে একদম চাপ নিতে হবে না। আমি সব সাইজ করে নিয়েছি"।
চান্দ্রেয়ীর মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। সে রেগেমেগে ফোন অফ করে ঘরে ঢুকল। মালিনী শাল জড়িয়ে খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন "চ খেতে চ"।
চান্দ্রেয়ীর কান্না পাচ্ছিল। ঋজু মদ খেলে এক্কেবারে অন্য মানুষ হয়ে যায়। কী করেছে, বাবাকে কী বলেছে সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। মালিনীর কথায় বলল "চল"।
ঘর লক করে দুজনে বেরোল। ডাইনিং স্পেসে পৌঁছে দেখল সৌরেন একটা টেবিলে এসে বসে আছেন। মালিনী অবাক গলায় বললেন "তুমি আবার কবে এলে?"
সৌরেন হাসি হাসি মুখে চান্দ্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন "এই তো এখনই। তন্দুরি রুটি আর চিকেন অর্ডার করে দিয়েছি"।
মালিনী বললেন "তা বেশ করেছ। কী যে কর না তুমি। তখন আসি বলে বাসি হয়ে গেলে। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর কফি একা একা খেলাম। মামণ তো মড়ার মত ঘুমোচ্ছিল"।
সৌরেন বললেন "তা বেশ করেছ। আমি তো এই হাঁটতে বেরিয়েছিলাম"।
সৌরেন চান্দ্রেয়ীর দিকে এক ঝলক তাকিয়েই মালিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন "একটা ইয়ং ছেলেদের গ্রুপের সঙ্গে আলাপ হল। কথা বলছিলাম বুঝলে। কলেজ লাইফ মনে পড়ে গেল এক্কেবারে"।
চান্দ্রেয়ী কাঠ হয়ে বসেছিল। মালিনী বললেন "তুমি কি শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকতে গেলে নাকি?"
সৌরেন মৃদু মৃদু হাসছিলেন "সে এক কাণ্ড। এক ছেলে মদ খেয়ে যা তা শুরু করেছে। আমাকেও এক পেগ খাইয়েই ছাড়ল"।
মালিনী রাগ করলেন এবার "তুমি আবার এসব কেন খেতে গেলে?"
সৌরেন বললেন "সে এক পরিস্থিতি, তুমি বুঝবে না। তবে ছেলেগুলো ভাল। আমার ভাল লেগেছে"।
সৌরেন চান্দ্রেয়ীর দিকে তাকালেন এবার।
চান্দ্রেয়ীর হঠাৎ করে মনে হল মাথা থেকে কেউ একটা পাথর সরিয়ে দিয়েছে। অনেকদিন পরে বাবাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা হল তার। মাঝে মাঝে নিজের অজান্তেই চোখে জল চলে আসে।

৩২

ভোর পাঁচটা। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল কেউ। শুভায়ু ঘুম জড়ানো গলায় বলল "এই বাপ্পা, বালটা, দরজাটা খোল না"।
বাপ্পা বলল "কেন, তোর পায়ে কি অ্যানথ্র্যাক্স হয়েছে? খাটের কোণায় তুই শুয়েছিস। তুই গিয়ে খোল"।
শুভায়ু বাপ্পাকে একটা লাথি মারল। বাপ্পা কাউ মাউ করে উঠে গালাগাল দিতে দিতে দরজা খুলল।
তাদের গাড়ির ড্রাইভার এসে দাঁড়িয়েছে। বাপ্পা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল "মারিয়েছে"। ড্রাইভারকে নীচে অপেক্ষা করতে বলে বাপ্পা দরজা বন্ধ করে বলল "ওরে নেশাখোর গাঁজাখোরের দল, পাঁচটা বাজে ওঠ। আমাদের মানালি বেরোনোর টাইম এখন"।
শুভায়ু পাশ ফিরে শুল। তন্ময় আর ঋজু অজ্ঞান হয়ে ঘুমোচ্ছে। বাপ্পা জোরে জোরে চেঁচাতে শুরু করল। শুভায়ু উঠে বাপ্পাকে আবার লাথি মারতে যেতেই বাপ্পা বাথরুমে ঢুকে চেঁচাতে লাগল "ওঠ নইলে আজ আর মানালি পৌঁছতে হবে না"।
শুভায়ু ঋজুকে ঠেলল "ওঠ রে ভাই। বেরোতে হবে"।

ঋজু কোনমতে চোখ খুলল। মাথা বিচ্ছিরিভাবে ধরে আছে তার। বলল “আজ ছেড়ে দে। কাল যাই”।
শুভায়ু বলল “কাল যা করলি, আর কোথাও না গেলেও হবে”।
ঋজু চোখ বড় বড় করে বলল “কী করলাম?”
তন্ময় উঠে পড়েছিল। ঋজুর দিকে তাকিয়ে বলল “নে ল্যাও, তোর কিছু মনে নেই তুই কী করেছিস?”
শুভায়ু বলল “আছে আছে, অনেকেই আছে, এত মাল খেয়ে ফেলে যে কী করেছে না করেছে তাদের কিছুই মনে থাকে না। শোন মামা, কাল তুই বোধ হয় একাই দশ বারো পেগ মাল খেয়েছিস”।
ঋজু বলল “তারপর?”
শুভায়ু বলল “তার আর পর নেই, নেই কোন ঠিকানা, যে গাঁড় মারা গেছে ভাল করে যাক না”।
ঋজু বিরক্ত হয়ে বলল “দূর, কী হয়েছে বলবি তো”!
শুভায়ু বলল “তুমি তোমার ছামিয়ার রুমে গেছিলে, শ্বশুরের সঙ্গে কাউন্টারে সিগারেট খেয়েছ, শ্বশুরকে এই হোটেলে এনে জোর করে মাল খাইয়েছ”।
ঋজু ফ্যাল ফ্যাল করে শুভায়ুর দিকে তাকিয়ে বলল “ধুস, কী যে বলিস, এই সবই তো আমি স্বপ্ন দেখছিলাম এতক্ষণ”।
তন্ময় আর শুভায়ু খিক খিক করে হাসতে লাগল। শুভায়ু বলল “স্বপ্নই বটে। তোর শ্বশুর মাইরি খাসা লোক আছে, জামাইকে দিয়ে গেল, বাঁধনের গল্পটা শুনল, তোর সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহারও করল, তুই তো ফালতু ভয় পেয়ে যাচ্ছিলি এত দিন ধরে”!
ঋজু খাট থেকে নেমে মেঝেয় উবু হয়ে বসে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল “মানে আমার রিলেশনশিপটার কি ফুল ফুল গাঁড় মারা গেছে বলছিস?”
শুভায়ু বলল “গাঁড় মারা গেছে বলে তো মনে হল না। উলটোটাই মনে হল। শ্বশুরের মনে হয় তোকে পছন্দই হয়েছে। না হলে তো ক্যালাতে ক্যালাতে নিয়ে আসত”।
ঋজু বলল “তুই আমার শ্বশুরকে চিনিস না। হয়ত আমাকে মেপে নিল। এবার ফুল কেস খাওয়াবে। চান্দ্রেয়ীও তো খচে আছে। আমার ফোনটা কোথায়?”
শুভায়ু হাত বাড়িয়ে খাটের পাশের ড্রয়ার থেকে ঋজুকে ঋজুর ফোনটা দিল। ঋজু বলল “এই দেখ। ফোন অফ। চার্জে নেই। চার্জ দে তো”।
ঋজু ফোনটা ছুঁড়ে দিল শুভায়ুকে। বাপ্পা বাথরুম থেকে বেরোল। শুভায়ু বলল “এই দেখ ভাই, ঋজু সব ভুলেই গেছে কাল কী হয়েছ”"।
বাপ্পা হাঁ করে ঋজুর দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা মেঝেতেই সাষ্টাঙ্গে শুয়ে ঋজুকে প্রণাম করে বলল “তুমি গুরুদেব মামা। তোমার চরণতলেই মাথা রেখে সারাজীবন কাটিয়ে দেব। একই দিনে শ্বশুর ফিট করলি, বউয়ের রাগও কমিয়ে দিলি”।
ঋজু হাঁ করে বাপ্পার দিকে তাকিয়ে বলল “রাগ কমালাম মানে”।
বাপ্পা নিজের মাথায় হাত দিয়ে বলল “দেখ কী অবস্থা, ওরে কাল চান্দ্রেয়ী আমার ফোনে ফোন করেছিল। তুই কথা বলেছিস ওর সঙ্গে। মনে হয় এর পরে আর কোন ঝামেলা হবে না”।
বাপ্পা দাঁত বের করল।
ঋজু চোখ বড় বড় করে ওভাবেই চুপ করে বসে থাকল।
বাপ্পা ব্যস্ত হয়ে বলল “যাই বাঁধনকেও তুলে দি”।
তন্ময় ফুট কাটল “হ্যাঁ, সকাল সকাল মুখ দেখার ধান্দা আর কী”।
বাপ্পা রেগে গেল “একদম ফালতু কথা বলবি না। ওকে ডাকতে হবে না? ও যাবে না আমাদের সঙ্গে?”
তন্ময় বলল “যা ভাই, যা, চাপ নিচ্ছিস কেন?”
বাপ্পা বেরিয়ে গেল।

ঋজু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলল “ভাই আমি আজ এই ভোর বেলা কথা দিচ্ছি, বিশ্বাস কর, আর জীবনেও আমি মদ খাব না। কী করে ফেললাম, কে জানে, চান্দ্রেয়ী মনে হয় আর আমার মুখও দেখবে না কোনদিন”।
শুভায়ু বলল “মদনদার দিব্যি মদ খাবি না?”
ঋজু বলল “ইয়ার্কি মারিস না ভাই। আমি কী করলাম কাল কে জানে। সব গেল বোধ হয়”।
শুভায়ু বলল “শোন ভাই, চাপ নিস না। বারবার বলছি চাপ নিস না। পৃথিবীতে অনেক মেয়ে আছে”।
ঋজু বলল “আমার একটা মেয়েকেই দরকার। ওসব কথা বলিস না”।
শুভায়ু বলল “উফ, উফ, আশিক দিওয়ানা এক্কেবারে”।
বাপ্পা ঘরে ঢুকে বলল “বাঁধন কিন্তু রেডি, আমিও। তোরা কিচ্ছু করিস নি এখনও”।
তন্ময় বলল “তুই ওকে নিয়ে চলে যা বাল। আমাদের টাইম লাগবে”।
বাপ্পা ব্যাজার মুখে বলল “যেতে পারলে তো ভালই হত। সে কপাল কি আর আমার আছে?”
শুভায়ু টিভির রিমোটটা বাপ্পার দিকে ছুড়ে মারল। বাপ্পা ছিটকে গেল। শুভায়ু উঠে ঋজুর কাঁধে হাত দিয়ে বলল “চহ, রেডি হয়ে নে। যা হবে দেখা যাবে। এখন এত চিন্তা করার কিছু নেই”।
ঋজু কিছু বলল না। ভ্যাবাচ্যাকা মুখে চুপ করে বসে রইল।

৩৩

সৌরেন গাড়ির সামনের সিটে বসলেন। পিছনে চান্দ্রেয়ী এবং মালিনী। হোটেলে চেক আউট করে, গাড়িতে মাল পত্র তুলতে তুলতে সকাল সাড়ে সাতটা বেজে গেল। ড্রাইভার বলে দিয়েছে রাস্তাতেই ব্রেকফাস্ট করার জন্য কোন রেস্তোরাঁয় দাঁড়াবে।
গাড়িতে উঠে চান্দ্রেয়ী দেখল ঋজু অনেকগুলো মেসেজ করেছে হোয়াটস অ্যাপে। সরি বলেছে অনেকবার। কাল রাতের পরে বাবার সঙ্গে ঋজুর ব্যাপারে চান্দ্রেয়ীর কোন কথা হয় নি কিন্তু এটা সে স্পষ্টই বুঝেছে বাবার ঋজুকে পছন্দ হয়েছে।
সিমলা ছাড়ছে যখন তারা তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কিন্তু চান্দ্রেয়ীর ভাল লাগছিল। ঋজুর অনেকগুলো মেসেজের উত্তরে শুধু একটা উত্তরই লিখল
“আই লাভ ইউ”।
#
দুপুর একটা।
একটা রেস্তোরাঁয় তারা দাঁড়িয়েছেন। সৌরেন বললেন “ড্রাইভার বলছে মানালি ঢোকার আগে মণিকরণটা করে নিতে। তাহলে কালকের দিনটা আমরা একটু রয়ে সয়ে কাটিয়ে পরশু রোটাং যাব। যেতে পারবে?”
মালিনী আঁতকে উঠলেন “সে আবার কতক্ষণ? এই রাস্তায় পারব?”
সৌরেন বললেন “কুলু থেকে মণিকরণের রাস্তা আলাদা। ঘন্টা দুয়েক বেশি লাগবে। মণিকরণ ঘুরে আবার কুলুর রাস্তায় নেমে তারপর মানালি যেতে হয়”।
মালিনী বললেন “মণিকরণে আছেটা কী?”
সৌরেন বললেন “উষ্ণ প্রস্রবণ আছে”।
মালিনী বললেন “পারব না বাপু। উষ্ণ প্রস্রবণ দেখতে বক্রেশ্বর চলে যাব না হয়। ওর জন্য অত ঘুরতে পারব না”।
ড্রাইভার আলাদা খাচ্ছিল। সৌরেন খানিকক্ষণ ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে এসে বললেন “তীর্থস্থানও বটে। হিন্দু আর শিখ উভয়েরই। তোমার আজকাল ধর্মে মতি দেখছিলাম ক'দিন ধরে”। কথাটা বলে সৌরেন হেসে ফেললেন। চান্দ্রেয়ী আর মালিনীও হাসলেন।

মালিনী বললেন “তোমার আর মামণের কী ইচ্ছা সেটা বল তো! আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আমি তো গাড়িতে উঠেই ঘুম দেব এবার”।
সৌরেন চান্দ্রেয়ীর দিকে তাকালেন “কী করবি?”
চান্দ্রেয়ী বলল “চল দেখেই নি”।
সৌরেন কাঁধ ঝাঁকালেন মালিনীর দিকে তাকিয়ে “ওই দেখো, মেয়েও দেখতে চাইছে, তাহলে তাই হোক, তুমি একটা লম্বা ঘুম দিয়ে নাও”।
মালিনী বললেন “সে তো এমনিতেও দিতাম। এখানে শীত আছে দেখেছ?”
সৌরেন বললেন “মানালিতে মাইনাস দুই যাচ্ছে”।
মালিনী চোখ বড় বড় করে বললেন “বল কী? শীতে জমে যাব তো”!
সৌরেন বললেন “চিন্তা কোর না। সিমলাতেও ছয় সাত ছিল। সইয়ে সইয়ে নিচ্ছি তো। মানালিতে গিয়ে দেখবে শীত গায়েই লাগবে না”।
চান্দ্রেয়ী সেই তখন ঋজুকে হোয়াটস অ্যাপে আই লাভ ইউ লিখে পাঠিয়েছিল। তারপর থেকে এখনও অবধি মেসেজটা সীন হয় নি। চান্দ্রেয়ীর রাগ হচ্ছিল। আবার নিশ্চয়ই ফোন চার্জ করতে ভুলে গেছে। চিরকালের কেয়ারলেস একটা।
ভাত নেওয়া হয়েছিল লাঞ্চে। দেরাদুন রাইসের লম্বা লম্বা চালের ভাত, চিকেন কষা।
মালিনী খেতে খেতে বললেন “মানালিতে একটু হালকা খাব বুঝলে। খুব চিকেন খাওয়া হয়ে যাচ্ছে”।
সৌরেন বললেন “হজমও তো হচ্ছে। সেটা না হলে সমস্যা ছিল”।
মালিনী বললেন “তা তো বটেই। জার্নির জন্য হচ্ছে না পাহাড়ের জল ভাল?”
সৌরেন বললেন “সবটা মিলিয়েই হবে। এখানে পলিউশনও নেই, সেটাও একটা ফ্যাক্টর বটে”।
মালিনী বললেন “এদের রান্না কী ভাল দেখেছ? ড্রাইভার ছেলেটা ভাল হোটেলেই দাঁড়ায়”।
সৌরেন বললেন “সেরকমই ইন্সট্রাকশন দেওয়া আছে ওকে। চিন্তা কোর না”।
খেয়ে বেরোতে বেরোতে দুটো বাজল।
গাড়িতে উঠে মালিনী চোখ বুজলেন। চান্দ্রেয়ী বেশ কয়েকবার মোবাইল চেক করছিল। ঋজু মেসেজ সীন করছে না।
বিরক্ত লাগছিল চান্দ্রেয়ীর।
#
দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। বিরাট জ্যাম। সৌরেন বিরক্ত গলায় বললেন “কী হল আবার?”
ড্রাইভার গাড়ি থেকে নামল।
খানিকক্ষণ পর ঘুরে এসে জানাল আগে একটা গাড়ি একটা ট্রাকে মেরে দিয়েছে। দুজন স্পট ডেট। বাকিদের অবস্থাও ভাল না।
মালিনী উঠে পড়েছিলেন, শুনে বললেন “হা ঈশ্বর, এ আবার কী!”
সৌরেন বললেন “হয়ে গেল। কতক্ষণ লাগে দেখো”।
চান্দ্রেয়ী চুপচাপ বসেছিল। হঠাৎ তার বুকটা ধড়াস করে উঠল। ঋজু ঠিক আছে তো?
তার মাথা কাজ করছিল না। বাবা মা থাকা সত্ত্বেও সে ফোনটা বের করে ঋজুকে ফোন করল।
ঋজুর ফোনটা সুইচড অফ বলছে।
বাপ্পার ফোনও অফ বলছে। চান্দ্রেয়ী গাড়ি থেকে নেমে গেল। মালিনী হাঁ হাঁ করে উঠলেন। সৌরেন মালিনীকে বললেন “কিছু না, গাড়িতে ওর পা লেগে গেছে হয়ত। আমি দেখছি”।
সৌরেনও নামলেন গাড়ি থেকে। চান্দ্রেয়ী গাড়ি থেকে নেমে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কী করবে বুঝতে পারছে

না। তার ইচ্ছা করছিল দৌড়ে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্টের জায়গাটা দেখে আসতে।
সৌরেন নরম গলায় বললেন "গাড়িতে গিয়ে বস। আমি দেখে আসছি। আশা করি চিন্তার কোন কারণ নেই"।
সৌরেনের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল চান্দ্রেয়ীর কান্না পেয়ে গেল। সে কেঁদে ফেলল।
সৌরেন মেয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন "গাড়িতে গিয়ে বোস মা"।

৩৪

চান্দ্রেয়ী মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল। তার টেনশনে জ্বর চলে এসেছে।
মালিনী বললেন "ঈশ, কেউ বেড়াতে এসেছিল, কী কপাল বল? মানুষের জীবনের কোন দামই নেই"।
চান্দ্রেয়ী ফোনটা বের করে আবার ঋজুকে ফোন করার চেষ্টা করল। সুইচড অফই শুনিয়ে যাচ্ছে। মালিনী বললেন "তুই এত অস্থির হচ্ছিস কেন মামণ? চুপচাপ বস না"।
চান্দ্রেয়ী বলল "কিছু না মা। অ্যাক্সিডেন্টটা শোনার পর থেকে কেন জানি না খুব টেনশন হচ্ছে। মনে হচ্ছে যদি আমাদের সঙ্গেও হয়"।
মালিনী বললেন "সে আর কী করবি বল? হওয়ার থাকলে হবেই, কেউ আটকাতে পারবে না। সেবার মনে নেই আমাদের ইয়ুমথাম যাওয়া ক্যান্সেল হয়ে গেল কী একটা কারণে আর সেবারই ওই রাস্তায় এমন ধ্বস নামল যে কত গাড়ি দু তিন দিন ধরে আটকে থাকল? সবই কপাল। কপালে যদি থাকে এই যে দেখছিস পাহাড়টা ডানদিকে, যে কোন সময় পাথরে ধ্বস নেমে আমরা মরে যেতে পারি। কয়েক বছর আগে উত্তরাখন্ডের কথা ভুলে গেলি? কত লোক মারা গেছিল বল তো বন্যা হয়ে?"
চান্দ্রেয়ী নিজের মনে মনে বলল "আমি এসেছি বলেই তো ওরা এসেছিল, যদি আমি না আসতাম তাহলেই বোধ হয় ভাল হত। কিছু হয় না যেন প্লিজ প্লিজ ঠাকুর"।
সৌরেন ফিরছিলেন, চান্দ্রেয়ী গাড়ি থেকে নামল। সৌরেন চান্দ্রেয়ীকে দেখে বললেন "কিছু বোঝা যাচ্ছে না। গাড়িতে যারা ছিল সবাইকে জাস্ট আমি যাবার আগেই হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কারা ছিল কেউ কিছুই বলতে পারছে না। তবে..."
চান্দ্রেয়ী জিজ্ঞাসু চোখে বাবার দিকে তাকাল। সৌরেন বললেন "গাড়িতে বাঙালি ট্যুরিস্টই ছিল সম্ভবত"।
চান্দ্রেয়ীর মাথা ঘোরাচ্ছিল। সে কোনমতে গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসল। সৌরেন পায়চারি করছিলেন। তারও একটু একটু টেনশন হচ্ছিল। ঋজু ছেলেটার সঙ্গে গতকাল থেকে দেখা হবার পর থেকেই অদ্ভুত একটা মায়া জন্মে গেছিল। তার তো রাগ করার কথা ছিল! অথচ পারলেন না। ছেলেটার মধ্যে নিজের যৌবন দেখতে পেলেন যেন গতকাল। অ্যাক্সিডেন্টের যা বর্ণনা শুনে এসেছেন তাতে গাড়িতে যে ক'জন ছিল কারই বেঁচে থাকার কথা না। সৌরেনের অস্বস্তি হচ্ছিল মেয়ের কথা ভেবে।
সৌরেনের ফোন বাজছিল। সৌরেন দেখলেন তনয়া ফোন করছে। সৌরেন গাড়ি থেকে আরেকটু দূরে গিয়ে ফোনটা ধ্রলেন "বল"।
তনয়া বলল "কোথায় এখন?"
সৌরেন বললেন "পাহাড়ী রাস্তায় আটকে আছি। একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে"।
তনয়া আঁতকে উঠলেন "কার তোমার?"
সৌরেন বললেন "না না, আমার না, একটা ট্রাকের সঙ্গে একটা গাড়ির। ভেতরে ট্যুরিস্ট ছিল"।
তনয়া বললেন "কী ভয়ানক। তোমার গাড়ির ড্রাইভারকে বোল সাবধানে চালায় যেন"!
সৌরেন বললেন "বলব। তোমার কিছু বলার আছে?"
তনয়া বললেন "তোমার হবু জামাই সম্পর্কে জানতে চাও না?"
সৌরেন বিরক্ত গলায় বললেন "তোমাকে তো বলেইছি না। কাল কথা হয়েছিল ওর সঙ্গে বলেছি তো"।
তনয়া বললেন "ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানো তো"?

সৌরেন বললেন "আমি কিছুই জানি না, জানার প্রয়োজনও বোধ করি না। রাখি এবার? জ্যাম ক্লিয়ার হচ্ছে"।
তনয়া বললেন "রাখো। আসলে তোমাকে বলতে চাইছিলাম, জানোই তো সিক্রেট আমি বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারি না"।
সৌরেন বললেন "আমার সিক্রেট জিনিসটাকে সিক্রেট হিসেবে রাখতেই খুশি হয়। তাছাড়া জেনে যাব তো। একদিন না একদিন তো সবই জানতে হয় তাই না? ঐ যে সুবীর না কী নাম লোকটার, প্রায়ই দুপুর দুপুর আসে তোমার কাছে, সেই সিক্রেটটা তো দিব্যি আমার কাছে চেপেই ছিলে। সেটা যখন পেরেছিলে, এটাও পারবে। ঠিক বলছি তো?"
তনয়া হালকা গলায় বললেন "আমার জীবিকার প্রয়োজনে আমায় যা যা করতে হয় তা সিক্রেট হবে কেন? তাছাড়া তো তুমি সব জানোই। এসব কথা মাঝে মাঝে কি না তুললেই হয়?"
সৌরেন বললেন "তুলতে কিছুই চাই না আমি, চলে আসে আর কী। কী করব বল?"
তনয়া বললেন "আচ্ছা, তোমার কিন্তু আমার কাছে ধীরে ধীরে আসা কমিয়ে দেওয়া উচিত, কী বল?"
সৌরেন বললেন "হঠাৎ এই কথা?"
তনয়া বললেন "না তোমার মেয়ের বিয়ের সময় এসে গেল, ছেলেপক্ষ যদি জানতে পারে মেয়ের বাবা খারাপ মেয়ের সঙ্গে মেশে, তাহলে বিয়েটাই হয়ত..."
সৌরেন ঠান্ডা গলায় বললেন "আমি সেসব ভয় পাই না তনয়া। আমি যা করেছি নিজের কাছে পরিষ্কার থেকে করেছি, এর জন্য আমার কোন কিছুই খারাপ মনে হচ্ছে না। বাকিদের কী মনে হবে আমার তাতে কিছু যায়ও আসে না"।
তনয়া বললেন "তোমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ি সব কিছু মেনে নাও নিতে পারে"।
সৌরেন বললেন "দেখো, আমি এখন এসব কথা নিয়ে আলোচনায় একেবারেই ইন্টারেস্টেড নই। হয়ত কথাগুলো প্রাসঙ্গিকই না এখন। একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে সামনে। আমি মামণকে বলতে পারছি না। গাড়িতে চারটে ছেলে একটা মেয়ে ছিল। তাদের মধ্যে দুজন স্পট। শুনলাম বাঙালি ট্যুরিস্ট। খুব সম্ভবত ওরাই ছিল। আমি এখন এসব নিয়ে খুব ঘেঁটে আছি তনয়া। আমি তোমাকে পরে ফোন করব"।
তনয়া কিছু বলতে যাবার আগেই সৌরেন ফোনটা কেটে দিলেন।
রাস্তা পরিষ্কার হয়েছে একদিকে যাওয়ার মত করে। গাড়ি ছাড়া শুরু হয়েছে। সৌরেন গাড়িতে গিয়ে বসলেন। মিরর দিয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন। চান্দ্রেয়ী পাথরের মত বসে আছে। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করে খানিকটা যেতেই অ্যাক্সিডেন্টে বিধবস্ত গাড়িটা দেখা গেল। গাড়ির সামনেটা পুরো দুমড়ে মুচড়ে গেছে। রাস্তায় কাঁচ পড়ে আছে। রক্তও।
চান্দ্রেয়ী চোখ বন্ধ করে বসে থাকল।
সৌরেন কয়েক সেকেন্ড একটু ইতস্তত করে বললেন "লোকাল হাসপাতালে যেখানে এদের নিয়ে গেছে, যাব একবার?"
মালিনী অবাক হয়ে বললেন "আমরা কী করব সেখানে গিয়ে? কাউকে চিনি না জানি না! তোমার মাথার মধ্যে আবার পরোপকারের ভূত চাপল কবে থেকে?"
চান্দ্রেয়ী কান্নায় ভেঙে পড়ল এইবারে, "চল বাবা, প্লিজ চল"।

৩৫

রাস্তায় যথেষ্ট জ্যাম ছিল। তবু ড্রাইভার যতটা সম্ভব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল। ড্রাইভারকে সৌরেন বুঝিয়েছেন অ্যাক্সিডেন্টের গাড়িতে তার পরিচিত লোকেরা ছিল। ড্রাইভার তার পরে আর কোন কথা বলে নি। নিজের মত করে চালাচ্ছে।

মালিনী হতভম্ব গলায় বললেন "আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। কে বা কারা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, মামণ কাঁদছে, তুমি বলছ হসপিটাল নিয়ে যেতে, কী হচ্ছে আমাকে কি কিছু বলবে?"
সৌরেন বললেন "বলব। তোমাকে বলব না তো কাকে বলব। আপাতত যে হসপিটালে নিয়ে গেছে সেখানে যাই। দেখে আসি কী হয়েছে আসলে"।
মালিনী বললেন "আমরা মানালি যাব না?"
সৌরেন বললেন "যাব না কেন? নিশ্চয়ই যাব"।
চান্দ্রেয়ী মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল। তার মনে হচ্ছিল হৃৎপিণ্ডটা ফেটে বাইরে চলে আসবে। বার বার মনে পড়ে যাচ্ছিল ঋজুর সঙ্গে প্রথম দেখা হবার দিনটা। নীল রঙের চেক জামা পরা ক্যাবলা ছেলেটা তার মুখের দিকে তাকাতেই পারছিল না।
চান্দ্রেয়ীই প্রথম ঋজুর হাত ধরে বলেছিল "তুমি এত ক্যাবলা কেন?"
ঋজু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলেছিল "আমি তো এমনই"।
সারাটা দিন তারা পায়ে হেঁটে কলকাতা ঘুরেছিল। কত কথা, ছোটবেলা থেকে জমানো একটার পর একটা গল্প তারা পরস্পরকে সারাদিন ধরে বলেছিল। দিন শেষে ফুচকা, আইসক্রিম খাওয়া।
এরপর যত দিন গেছে দুজনে তত কাছে এসেছে। ঋজু অত্যন্ত পজেসিভ তার ব্যাপারে। চান্দ্রেয়ী সেটা এনজয় করত, খ্যাপাতো, আবার তার কোন বন্ধু যখন ঋজুর সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলতে যেত তার মাথায় আগুন জ্বলে যেত। মনে হত মেয়েটাকে ঝাটা পেটা করে। সিমলায় মেয়েটার সঙ্গে ঋজুকে দেখে স্বাভাবিকভাবেই তার মাথায় আগুন ধরে গেছিল। পরে সবটা শোনার পর নিজের ওপরেই লজ্জা হয়েছিল তার। কী করে ঋজুকে সন্দেহ করেছিল সে? সেই ঋজু যে শুধু তার জন্য এতদূর এত ঝক্কি সামলে চলে এসেছে।
চান্দ্রেয়ী কিছুতেই চোখের জল সামলাতে পারছিল না। বিকেল সাড়ে চারটে হয়ে গেছে।
মালিনী চান্দ্রেয়ীর মাথায় হাত রেখে বললেন "আমায় কি বলা যাবে মামণ কী হয়েছে?"
চান্দ্রেয়ী মালিনীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। মালিনী চান্দ্রেয়ীর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বিস্মিত হয়ে সৌরেনকে বললেন "আমি যা ভাবছি তা কি ঠিক?"
সৌরেন বললেন "হু। মাথা ঠান্ডা রাখো"।
মালিনী বললেন "আমি মাথা ঠান্ডাই রেখেছি, তুমি জানতে যদি আমাকে বল নি কেন কিছু"?
সৌরেন বললেন "বলতাম নিশ্চয়ই সময় সুযোগ বুঝে। তোমার শরীর, নার্ভ সবকিছু মাথায় রেখে"।
মালিনী বললেন "তা বটে। ছেলেটাকে তুমি দেখেছ?"
সৌরেন বললেন "হ্যাঁ। কাল বললাম না একটা ইয়ং ছেলেদের গ্রুপের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ওরাই। মামণ বেড়াতে এসেছে তাই ছেলেটাও এসেছিল বন্ধুদের সঙ্গে"।
মালিনী সৌরেনের দিকে তাকালেন "ছেলেটা কেমন?"
সৌরেন বললেন "ভাল। কিন্তু ভাল খারাপটা এখন ম্যাটার করবে না মালিনী যদি গাড়িটাতে..."
চান্দ্রেয়ী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মালিনী চান্দ্রেয়ীকে জড়িয়ে উদ্বিগ্ন গলায় বললেন "এসব বোল না কিছু। ভাবতেও তো আমার কেমন যেন লাগছে"।
সৌরেন বললেন "তুমি নিজেকে সামলাও আগে। এই জন্য তোমাকে কিছু বলতে চাই না আমি"।
মালিনী বললেন "সামলাতেই হবে, মেয়ের জন্য তো আমাকে ঠিক থাকতেই হবে"।
সৌরেন চুপ করে বসে রইলেন।
মিনিট দশেকের মধ্যেই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে পৌঁছে গেলেন তারা। সৌরেন বললেন "তোমরা গাড়িতে থাকো, আমি দেখে আসছি"।
চান্দ্রেয়ী ধরা গলায় বলল "আমি যাব বাবা, আমাকে নিয়ে যাও"।

সৌরেন কঠিন গলায় বললেন “না, তুমি যাবে না, বসে থাকো”।
চান্দ্রেয়ী চুপ করে বসে রইল। সৌরেন দ্রুত পায়ে হসপিটালের ভিতর ঢুকে গেলেন।
মালিনী বললেন “আমাকে বলিস নি কেন মা? আমি কি কখনও না করতাম তোকে?”
চান্দ্রেয়ী বলল “বলতাম”।
মালিনী ক্লান্ত গলায় বললেন “আমারই দোষ। তোর প্রতি নজরই দিতে পারি নি কোন দিন”।
চান্দ্রেয়ী কাঁদতে কাঁদতে বলল “তুমি আর কত নজর দেবে মা? প্লিজ এরকম করে বোল না”।
সৌরেনকে দেখা গেল আসতে। চান্দ্রেয়ী গাড়ি থেকে নামতে যাবে এমন সময় তার ফোন বেজে উঠল, সে দেখল একটা আননোন নাম্বার থেকে ফোন আসছে।
সে ফোনটা ধরল, ওপাশ থেকে একটা গলা ভেসে এল “আর বোল না, বাপ্পা বোকচোদটা গেম খেলে খেলে নিজের ফোনটাও গাধার ইয়েতে পাঠিয়ে দিয়েছে, আর আমারটা তো কাল চার্জই দেওয়া হয় নি। শুভায়ুর ফোন থেকে ফোন করছি, আমরা এই মানালি পৌঁছলাম”।
চান্দ্রেয়ীর হাত থেকে ফোনটা পড়ে গেল। সে জোরে চেচিয়ে উঠল। মালিনী মেয়েকে ধরে বললেন “কী হয়েছে?”
চান্দ্রেয়ী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল “বেঁচে আছে মা, বেঁচে আছে”।
সৌরেন চলে এসেছিলেন। চান্দ্রেয়ীর মাথায় হাত রেখে বললেন “বাকি দুজনও মারা গেছে। ঋজুরা নয়। তবে ওরাও বাঙালি ছিল। ঋজু ফোন করেছিল না?”
চান্দ্রেয়ী মাথা নাড়ল জোরে জোরে।
সৌরেন শ্বাস ছেড়ে বললেন “মালিনী, আমি এতক্ষণ উপরওয়ালার কাছে একটা প্রার্থনা করছিলাম, যদি এই অ্যাক্সিডেন্টে ছেলেটা না থাকে তাহলে তোমাকে আমি একটা কথা জানাব। তুমি শুনবে আমি যেটা বলব?”

৩৬
“উফ ভাই কী শীত রে, নিজের লাড্ডুদুটো খুঁজে পাব না এরপরে”। বাপ্পা শীতে কাঁপতে কাঁপতে বলল।
শুভায়ু বলল “শীতের জায়গায় তো শীতই থাকবে। গরম থাকবে নাকি?”
তন্ময় এসেই কম্বলের তলায় সেঁধিয়ে গেছিল। চিচি করে বলল “ভাই, ব্র্যান্ডি কিনে আন কেউ। এমনি মদে হবে না”।
বাপ্পা বলল “ব্র্যান্ডির ভাই হয়েছে। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী জিন্দাবাদ। হালকা গরম জল করে নেব, আহ, বডি পুরো ভিসুভিয়াস হয়ে যাবে”।
শুভায়ু বলল “দেখিস ভাই, ভিসুভিয়াস হবার পর আবার দেওয়ালে ঘষে দিস না পেন্সিলটাকে”।
বাপ্পা কটমট করে শুভায়ুর দিকে তাকিয়ে বলল “দেখ শুভায়ু, একদম ফালতু কথা বলবি না। আর আমি দেখেছি, বাঁধনের সামনে আমাকে ডাউন করার একটা, একটা, কী যেন বলে, ইয়েস, একটা প্রয়াস, একটা প্রচেষ্টা তোর মধ্যে দেখা দিয়েছে”।
শুভায়ু বলল “তোকে ডাউন করব তার আবার বাঁধনের সামনে পিছনে কী রে? তোকে তো সারাক্ষণই ডাউন করি”।
তন্ময় কম্বলের তলা থেকে বলল “ভাই যা দিবি দে, আমাকে এক পেগ বানিয়ে দে প্লিজ”।
বাপ্পা ব্যাগ থেকে ওল্ড মংকের একটা বোতল বের করল। শুভায়ু বলল “ঋজু কী করছে?”
বাপ্পা বলল “হাঁটতে বেরিয়েছে। মালটার শীত লাগে না মনে হয়”।
শুভায়ু বলল “ভাই আর যাই করিস, ভুলেও ওকে এক ফোঁটাও মদ খাওয়াস না। ও বালটা মদ খাবার পর যে কী হয়ে যায় ওই জানে”।
বাপ্পা বলল “খেপেছিস? ঋজুকে আর মদ খাওয়াই? আমাকে পাগলা কুকুরে কামড়েছে নাকি বে?”

শুভায়ু বলল "কী যে বালের হোটেলে উঠেছি, গিজার নেই, ড্রাইভারটা মহা খচ্চর, শিওর কাটমানি খেয়েছে। বলে কী না, গরমজল শুধু সকালে থাকবে!"
তন্ময় বলল "এই বাজেটে যে সকালে গরমজল পাচ্ছিস এই অনেক"।
শুভায়ু বলল "তা তো বলবিই। যা না, একবার হেগে ছুঁচে আয় না বোকাচোদা, পোঁদে যখন মাইনাস থ্রির বরফটা চুমু খাবে, তখন দেখবি বাপের নাম বারাক ওবামা হয়ে গেছে"।
তন্ময় বলল "আগে জানলে হাগিস কিনে নিয়ে আসতাম। হাগব না বাঁড়া। যা হবে হবে"।
বাপ্পা বলল "ঈশ, বাঁধনটার খুব কষ্ট হবে"।
তন্ময় বলল "হ্যাঁ, এক কাজ কর, তুই চেটে দিয়ে আয় ও যখন ছুঁচবে, আর কষ্ট হবে না"।
বাপ্পা রাগল না, ফিকফিক করে হাসতে হাসতে বলল "ধুস। কী যে বলিস!"
শুভায়ু অবাক হয়ে বলল "এই দেখো, বানচোদ ব্লাশ করছে, এটাকে দেয় কে?"
তন্ময় বলল "কেউ দেয় না বলেই তো এই অবস্থা"।
শুভায়ু বলল "বাপ্পা ভাই তুই বস। দু তিন পেগ খেয়ে, হালকা হিসি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়। তোর মাথায় উঠে গেছে সব কিছু। কোনদিন দেখবে একটা কানের ফুটো দিয়ে, আরেকটা নাকের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে গেছে"।
বাপ্পা গোঁজ হয়ে বসে পড়ল সোফায়।
তন্ময় বলল "হোটেলটা ঢপের হলে কী হবে, একটা জিনিস ভাল। এক্কেবারে বিয়াসের ধারে"।
শুভায়ু বলল "ভাই এই শীতে আমার আর কোন নদী টদী মাথায় আসছে না। খাবার ঘরে দিয়ে যেতে বল, খেয়ে টেনে ঘুম লাগাই"।
তন্ময় বলল "বাপ্পা,ডিনার বলে দে ভাই"।
বাপ্পা বলল "নিজেরা বল। আমি বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হব এখন"।
তন্ময় বলল "বল না ভাই। প্লিজ। এখন কে কম্বল থেকে বেরবে বল। আচ্ছা তোকে আর চাটব না। শিওর"।
বাপ্পা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলল "ওকে, কে ক'টা রুটি খাবি বল"।
#
হোটেলের সামনেই বিয়াস নদী বয়ে চলেছে।
প্রচন্ড শীত পড়ছে। ঋজুর খেয়াল ছিল না। সে হোটেলের কাঠের বেঞ্চে চুপচাপ বসে সিগারেট টানছিল।
"একটা কাউন্টার দিও তো"।
কখন বাঁধন চলে এসেছিল ঋজু খেয়াল করে নি।
ঋজু সিগারেটটা বাঁধনের দিকে এগিয়ে দিল।
বাঁধন বলল "তুমি আজ মদ খাবে না তো?"
ঋজু হেসে ফেলল "আর খাই? খেপেছ? কাল যে কী কী হল!"
বাঁধন সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে বলল "আমাকে চুমু খেতে গেছিলে সেটা মনে আছে?"
ঋজু কয়েক সেকেন্ড হতভম্ব হয়ে বাঁধনের দিকে তাকিয়ে বলল "রিয়েলি?"
বাঁধন হাসল "হ্যাঁ। তবে একটা জিনিস দেখলাম, আমি বাধা দিতে তুমি বেশ লজ্জায় পড়ে গেছিলে। তারপরেই তো তুমি চান্দ্রেয়ীদের রুমে চলে গেলে"।
ঋজু মুখ কাঁচুমাচু করে বলল "আমি এক্সট্রিমলি সরি। ভাবতে পারছি না বিশ্বাস কর"।
বাঁধন মাথা নাড়ল "হয় হয়, চিন্তা কোর না। ফ্রাস্ট্রেটেড ছিলে কালকে। ওসব থেকে হতেই পারে"।
বিয়াসের জলে আশে পাশের হোটেলের আলো পড়ছে। ঋজু কয়েক সেকেন্ড সেদিকে তাকিয়ে বলল "আমরা যে রাস্তা দিয়ে এসেছি, জাস্ট তার এক দেড় ঘন্টা পরেই সে রাস্তায় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমাদের মতই গাড়িতে চারটে ছেলে আর একটা মেয়ে ছিল। বাঙালি ট্যুরিস্ট। সবাই স্পট ডেড। আমার ফোন অফ ছিল। চান্দ্রেয়ীর কাছে বাপ্পার নাম্বার ছিল। বাপ্পার ফোনও অফ হয়ে গেছিল। ও ভেবে নিয়েছিল

হয়ত আমাদেরই... হাসপাতাল অবধি চলে গিয়েছিল ওর বাবাকে নিয়ে। এদিকে আমার বাড়িতেও বিচ্ছিরি অবস্থা। খবর দেখে বাবাও ফোন করেছিল। অনেকক্ষণ পরে যখন ফোন করলাম তখন বাড়ির লোকও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।"

বাঁধন বলল "পাহাড় মানেই... কী ভয়ংকর, অথচ সুন্দর, তাই না? এমন কপাল দেখো, ঐ মেয়েটার জায়গায় আমি মরলেই ভাল হত। কী যে করব এরপরে কিছুই বুঝতে পারি না"।

ঋজু বলল "তুমি মরলে তো আমরাও মরতাম! ব্যাপারটা অনেকটা প্যাকেজের মতন। একজনের সঙ্গে বাকিরা ফ্রি। মরে যাওয়াটা কি কোন সলিউশন হতে পারে?"

বাঁধন বলল "তুমি নিজেকে আমার জায়গায় কল্পনা কর। কী করতে তুমি আমার জায়গায় থাকলে?"

ঋজু বাঁধনের হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে একটা টান দিয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল "জানি না"।

দুজনে কয়েক মিনিট অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে বসে থাকল।

বাঁধন বলল "সম্পর্কে মনে হয় আর্থিক নিরাপত্তাটাও দরকার। তোমাদের সেটা আছে। আমাদের ছিল না। তাই অতবড় সিদ্ধান্ত নিয়েও ওকে পালিয়ে যেতে হল"।

ঋজু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার ফোন বেজে উঠল। দেখল চান্দ্রেয়ী ফোন করছে, ধরল "বল"।

"বাবা জানতে চাইছে তোমরা কোন হোটেলে উঠেছ"?

"কেন বলত?"

"আরে বলই না"।

ঋজু তাদের হোটেলের নাম বলল।

চান্দ্রেয়ী বলল "রিসেপশনে খোঁজ নাও একটা রুম হবে নাকি"।

ঋজু অবাক হয়ে বলল "মানে?"

চান্দ্রেয়ী বলল "মানে আবার কী! আমরা ওই হোটেলেই উঠব। আমাদের এখনও আধঘন্টা লেগে যাবে পৌছতে। মা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে"।

ঋজু হাঁ হয়ে গেছিল। কয়েক সেকেন্ড লাগল তার নিজেকে সামলাতে।

#

"এই সব কী চুতিয়াপা ভাই? দূরে ছিলাম, এই তো ভাল ছিল। এবার তো সত্যিকারের সন্ন্যাসীর মত লাইফ কাটাতে হবে"!

শুভায়ু বেশ রাগতভাবেই ঋজুকে বলল।

ঋজু মাথা নিচু করে ছিল, বলল "আমি কী করে জানব? ওরা ঠিক করে ফেললে আমাদের কী? তোরা তোদের মত থাকবি, সমস্যা কোথায়?"

শুভায়ু বলল "সমস্যা আছে ভাই। এইসব জায়গায় একটু মনের মত জল পুলিশের আন্ডারে না গেলে হয়? এবার ওরা তো বয়স্ক লোকজন, ওদের সামনে কী করে হবে?"

ঋজু বলল "দেখ, তোরাই তো বললি ওর বাবা আমার জোরাজুরিতে কাল এক পেগ খেয়েছিল"?

শুভায়ু বলল "সেটা তো তুই মাতাল হয়ে গেছিলি, তোকে সামলানোর জন্য খেয়েছিল। কিন্তু ওর মা থাকবে, তোর বউ থাকবে, আমাদের তো একটা ইম্প্রেশনেরও ব্যাপার থাকবে... দূর বাল, তুই বুঝছিস না"।

ঋজু মাথা চুলকে বলল "আমি কী করে বুঝব?" বাপ্পা রিসেপশন থেকে জল আনতে গেছিল। এসে বলল "ডিনার আজ রুমে দেবে না, ডাইনিং টেবিলে যেতে বলছে"।

শুভায়ু বলল "দেখ, কী বালের হোটেল। টোটাল ঝাঁট জ্বলে গেল"!

ঋজুর ফোনে এস এম এস এল। চান্দ্রেয়ী। "রিসেপশনে এসো। আমরা এসে গেছি"।

৩৭

বাঁধন রুমেই ছিল। চান্দ্রেয়ী বেল বাজালে বাঁধন দরজা খুলল।

চান্দ্রেয়ী হাসল "বাঁধন, রাইট?"

বাঁধন বলল "তুমিই চান্দ্রেয়ী"?

চান্দ্রেয়ী বলল "হ্যাঁ"।

বাঁধন বলল "এসো এসো"।

চান্দ্রেয়ী ঢুকল বাঁধনের রুমে। বাঁধন বলল "ঋজু তো সারাক্ষণ তোমার কথাই বলে যায়। ভাগ্য করে একজন প্রেমিক পেয়েছ তুমি"।

চান্দ্রেয়ী বাঁধনের খাটে বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল "আজ যা গেল"।

বাঁধন বলল "শুনলাম, কী ভাগ্য বল, বেড়াতে এসেছিল মানুষগুলো। আমি একটা জিনিস দেখেছি জানো, যখন মনে হয় আমার আর এই পৃথিবীতে থাকার দরকার নেই, তখন কিছুতেই কোনভাবেই আমার সঙ্গে কোন রকম অ্যাক্সিডেন্ট ঘটবে না। খুব ভাল ভাবে বেঁচে থাকব আমি। আর কেউ যখন ভাবতেও পারবে না, কোন রকম প্রস্তুতি থাকবে না তার, তাকে বিনা নোটিসেই চলে যেতে হবে"।

চান্দ্রেয়ী বাঁধনের দিকে তাকিয়ে বলল "তুমি খুব সুন্দর কথা বল বাঁধন। জানো, তোমাদের দেখে আমার প্রথমে ভীষণ রাগ হয়েছিল। দোষটা অবশ্য ঋজুরই। আমাকে যদি বলে দিত প্রথমেই তাহলে এত ঝঞ্ঝাট হত না। অবশ্য ওরই বা দোষ কী করে ধরি। আমার সঙ্গে যা হল। বাবা কোত্থেকে জেনে ফেলেছিল সব। একেবারে রেগে আগুন হয়ে ছিল, আমি তো বুঝতেই পারছিলাম না কী করব। চণ্ডীগড় স্টেশনে নেমে একবার বলে ডালহৌসি যাব, একবার বলে অমৃতসর যাব, সে একেবারে যা তা ব্যাপার। ম্যাজিকটা করল অবশ্য ঋজুই। মদ টদ খেয়ে..."

দুজনেই হেসে ফেলল।

বাঁধন বলল "তা ঠিক। ঋজুর অ্যাপিয়ারেন্সটাই এমন, ভাল না বেসে পারা যায় না"।

চান্দ্রেয়ী বাঁধনের দিকে তাকাল।

বাঁধন হেসে চান্দ্রেয়ীর হাতটা ধরে বলল "আমার কথা ভুলেও ভেবো না। আমি যাকে ভালোবেসেছিলাম, আমি জানি, আমি যতটা কষ্ট পাচ্ছি, সেও ঠিক ততটাই কষ্ট পাচ্ছে"।

চান্দ্রেয়ী বলল "যদি সে ফিরে আসে? কী করবে?"

বাঁধন অন্যদিকে তাকাল, "জানি না"।

দরজা খোলাই ছিল। বাপ্পা নক করে ঢুকল "বাঁধন, তুমি ডিনার করবে না?"

বলেই চান্দ্রেয়ীকে দেখে দাঁত বের করল "ওহ, বউদি এখানে"?

বাঁধন বলল "হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি, তুমি যাও"।

বাপ্পা বলল "তোমার খাবারটা দিয়ে যাব?"

বাঁধন বলল "না না, আমি যাচ্ছি"।

বাপ্পা কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে মাথা চুলকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চান্দ্রেয়ী হেসে ফেলল "বাপ্পা তোমায় খুব লাইন মারছে বল?"

বাঁধন বলল "তা মারছে। কলকাতায় ফিরে আর মারবে না। শুনলাম ওরা ব্রাহ্মণ। শহরটা আর আগের মত নেই চান্দ্রেয়ী"।

চান্দ্রেয়ী বলল "তুমি কী করবে এখন?"

বাঁধন দীর্ঘশ্বাস ফেলল "জানি না, কোথায় যাব, কী করব কিচ্ছু জানি না"।

চান্দ্রেয়ী বলল "তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে। আমাদের বাড়িতে থাকবে। বুঝেছ?"

বাঁধন কয়েক সেকেন্ড চান্দ্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে বলল “কথাটা তুমি ভেবে বলেছ?”
চান্দ্রেয়ী বলল “হ্যাঁ। আমি ভেবে বলেছি। ইনফ্যাক্ট আমার বাবার সঙ্গে এই কথাটা নিয়ে আলোচনাও করেছি”।
বাঁধন মাথা নিচু করল। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল “আমি কিন্তু খুব একটা ভাল মেয়ে না চান্দ্রেয়ী। আমি স্মোক করি, ড্রিংক করি”।
চান্দ্রেয়ী বলল “স্মোক করা আর ড্রিংক করলে সে মেয়ে খারাপ হয়ে যায় সেটা কোথাও লেখা নেই তো বাঁধন। এই মুহূর্তে আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। তোমার পাশে থাকতে চাই”।
বাঁধন চান্দ্রেয়ীর ধরে থাকা হাতে মৃদু চাপ দিল। পরক্ষণেই হেসে ফেলে বলল “তবে তোমার ঋজুকে মদ খাওয়ার এগেইন্সটে যা যা দিব্যি থাকে দিয়ে দিও। ছেলেটা মদ খেলে পাগল হয়ে যায়”।
দুজনেই হেসে ফেলল।
দরজায় আবার কেউ নক করল। বাইরে থেকে সৌরেনের গলা শোনা গেল। চান্দ্রেয়ী চ্যাচাল “দরজা খোলা আছে বাবা”।
সৌরেন ঘরে ঢুকে উত্তেজিত ভাবে বললেন “মামণ, একটা যাতা ঘটনা ঘটেছে”।
চান্দ্রেয়ী বলল “কী বাবা?”
বাঁধনও উৎসুকভাবে সৌরেনের দিকে তাকাল।
সৌরেন বললেন “ঋজু আমার স্কুল লাইফের বন্ধু আদিত্যর ছেলে। জাস্ট কথায় কথায় বেরিয়ে এল। কী কোইন্সিডেন্স ভাব জাস্ট। আদিত্যর সঙ্গে সেই মাধ্যমিকের পর কোন যোগাযোগই ছিল না। আজ অনেকদিন পরে কথা হল। আমি তো ভাবতেই পারছি না রে!”
চান্দ্রেয়ী হেসে ফেলল।
আজ কি সব স্বপ্ন সত্যি হবারই দিন?

৩৮

ভোর ছ’টা। সূর্য উঠেছে খানিকক্ষণ আগে। আকাশ একেবারে নির্মেঘ নয়। তবে বৃষ্টি হবার কোন সম্ভাবনা নেই আপাতত।
মালিনী এবং সৌরেন ঘর থেকে বেরিয়েছেন। বেশ খানিকটা হেঁটে তারা বিয়াস নদীর ধারে একটা পাথরের ওপরে বসলেন।
মালিনী বললেন “বল, তোমার কী সিক্রেট কথা বলার ইচ্ছে হয়েছে”।
সৌরেন ম্লান হাসলেন “কাল না শুনে ভালই করেছ। কাল এমনিতেও যা গেল”।
মালিনী বললেন “একটা কথা আছে না, যা হয় ভালর জন্যই হয়? হয়ত তাই”।
সৌরেন বিয়াসের দিকে তাকালেন। খরস্রোতা নদী। কিছুদিন আগে কয়েকটা ছেলে এই জলেই স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায়। হঠাৎ প্রচুর পরিমাণে জল এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাদের। প্রকৃতি এরকমই আনপ্রেডিক্টেবল। সৌন্দর্যের মধ্যেও ভয়াবহতা মিশিয়ে রেখেছে।
মালিনী বললেন “আচ্ছা আজ আমরা কোথায় কোথায় যাব?”
সৌরেন বললেন “হিড়িম্বা টেম্পল যাব, বশিষ্ট মুনির আশ্রম, আরও কিছু লোকাল সাইট সিন করে নেব”।
মালিনী বললেন “হিড়িম্বা মন্দির না? কী অদ্ভুত না? হিড়িম্বা নামের মন্দির”।
সৌরেন বললেন “অদ্ভুতই বটে। অনার্য দেবতার পুজো আর্য দেশে অদ্ভুত তো বটেই। ঘটোৎকোচের মা, যে না থাকলে অত কম সৈন্যেও হয়ত পান্ডবেরা কৌরবদের সঙ্গে লড়াই করে উঠতে পারত না”।
মালিনী বললেন “তা বটে। আচ্ছা এবার কী বলছিলে সেটা বলবে? ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে হবে না তোমায়, বল এবার।”

সৌরেন মালিনীর দিকে তাকালেন, "বিয়ের এত বছর পর মনে হচ্ছে তোমার প্রতি আমি সুবিচার করিনি মালিনী"।
মালিনী হাসলেন "আর কী সুবিচার করবে? এত ভালভাবে একটা রুগীকে পুষে যাচ্ছ বছরের পর বছর, এর থেকে আর কী বেশি প্রাপ্য ছিল আমার, তুমিই বল"।
সৌরেন বললেন "হানিমুনের কথা মনে আছে তোমার? সেই দার্জিলিং? টয়ট্রেনে উঠে মনে পড়ল নতুন কেনা ইয়াশিকা ক্যামেরাটা প্ল্যাটফর্মে ফেলে এসেছি"।
মালিনী বললেন "মনে থাকবে না? কেউ ভুলতে পারে সেসব? ঈশ, তোমার সেই ভুলোমন, এখনও তো দেখি, কত কিছু ভুলে যাও, বেরিয়ে যাচ্ছ অফিসের জন্য, আবার ফিরে আসছ, কোনদিন পেন ফেলে যাচ্ছ, কোনদিন মোবাইল"।
সৌরেন মালিনীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন "মালিনী আমি তোমায় ঠকিয়েছি, আমার জীবনে একজন মহিলা আছে যার সঙ্গে আমার নিয়মিত ফিজিক্যাল রিলেশন হয়"।
একবারে কথাটা বলে সৌরেন মালিনীর দিক থেকে চোখ সরালেন না। কথাটা বলতেই হত তাকে। গতকালই ঠিক করে নিয়েছিলেন।
মালিনী সৌরেনের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নদীর দিকে তাকালেন। সৌরেন বললেন "কিছু বলবে না তুমি?"
মালিনী বললেন "বিয়ের ক'দিন পর থেকে তোমার চোখ দেখে আমি বুঝে যেতাম সৌরেন তোমার কী চাই, কোনটা তুমি পছন্দ কর, কোনটা অপছন্দ। যত দিন গেছে, তোমার সঙ্গে শারীরিকভাবে আমি দূরে সরে গেছি। একেক দিন, একেক রকম ভাবে, আমি বুঝতাম সবই। কিছু বলি নি। শারীরিকভাবে একজন স্ত্রী হিসেবে আমি শেষ হয়ে গেছিলাম সৌরেন, তোমাকে আমি কিছু দিতে পারি নি, আমি কী করতাম বল? চিৎকার করে পাড়ার লোক জড়ো করে হাসির খোরাক হতাম? চাকরিও তো করতাম না, মেয়েকে নিয়ে আলাদা হয়ে কী খাওয়াতাম মেয়েটাকে? দিনের পর দিন ভেবেছি, শেষমেশ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, থাকব, এইরকম সব কিছু থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেব। কাল যখন তুমি আবেগের বশে বলছিলে আমার সঙ্গে কোন সিক্রেট শেয়ার করতে চাও আমি তখনই বুঝে গেছিলাম তুমি কী বলবে, আমি ইচ্ছা করেই শুনতে চাই নি, ওখানে মামণ ছিল, কথাগুলো ওর না জানাই ভাল। কিছু কিছু কথা বড়দের কথা হিসেবে থাকাই ভাল। সন্তানদের না শুনলেও হয়"।
সৌরেন চুপ করে মালিনীর কথা শুনছিলেন, বললেন "তুমি জানতে?"
মালিনী বললেন "তুমি তো সেভাবে কোন কিছুই লুকিয়ে রাখতে পারো নি, সেটা অ্যানিভারসারির দুদিন আগে আমার জন্য কেনা নেকলেস কিংবা মামণের জন্য সারপ্রাইজ বারবিগুলো। এত বড় একটা কথা কীভাবে লুকিয়ে রাখবে তুমি?"
সৌরেন চুপ করে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। রাস্তা দিয়ে গাড়ির শব্দ এবং নদীর বয়ে যাবার শব্দ বাদ দিয়ে চারিদিক অদ্ভুত রকম শান্ত।
মালিনীর চোখ থেকে নীরবে জল পড়ছিল।
সৌরেন বললেন "আমায় ক্ষমা করে দিও পারলে"।
মালিনী নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বললেন "যে লোকটা বউকে লুকিয়ে অন্য মেয়ের কাছে যায়, সেই লোকটাই তো পরম যত্নে বউয়ের বিছানা করে দেয়, প্রতিটা ওষুধ সময় মনে করে খাইয়ে দেয়, কোনদিন কখনও একফোঁটাও কর্তব্যচ্যুত হয় না। কী করব সে লোকটাকে বল? এভাবে দোষ স্বীকারই বা ক'টা মানুষ করে সৌরেন?"
সৌরেন কথা বলতে পারলেন না। মালিনীর হাত ধরে বসে থাকলেন।
অনেক দিন পরে। কত দিন পরে নিজেই মনে করতে পারছিলেন না।

#
বাঁধন ঘুমাচ্ছিল।
রাতে ঘুমাতে দেরী হয়ে গেছিল। কিছুতেই ঘুম আসছিল না গতকাল রাতে। মাথা ব্যথা করছিল, জার্নি বেশি হলে তার এই সমস্যাটা হয়।
ফোন ভাইব্রেশন মোডে ছিল।
জোরে জোরে ভাইব্রেট করতে শুরু করল হঠাৎ ফোন। তার ঘুম ভেঙে গেল।
ঘুম চোখে ফোনটা ধরল সে, “হ্যালো”।
“যদি বলি আমায় ক্ষমা করে দিতে, পারবে তুমি বাঁধন?”
অনেক দিন পরে একটা পরিচিত গলা।
অনেক দিন পরে।
বাঁধন পরম যত্নে ফোনটা কানে দিয়ে শুয়ে থাকল।
অনেক সময় কথা না বলেও অনেক কিছু বলা হয়ে যায়...